# দুই নদী

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কথাকলি
১ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলিকাতা ৯

প্রথম সংস্করণ : স্বাধীনতা দিবস ১৩৬৮

প্রকাশক :

প্রকাশচন্দ্র সিংহ

১ পঞ্চানন ঘোষ লেন

কলিকাতা ৯

মুদ্রক :

জিতেন্দ্রনাথ বসু

দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া

৩।১ মোহনবাগান লেন

কলিকাতা ৪

প্রচ্ছদ :

গণেশ বসু

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :

স্কোয়ার প্রিন্টার্স

পরিবেশক :

ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ

২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা ১২

দাম : দু টাকা পঁচাত্তর ন. প.

মাতৃদেবী

৺সুরুচি দেবীর

স্মৃতি উদ্দেশে

সংগ্রামে জয়ী হবার একটা তীব্র আনন্দ আছে। কিন্তু সে আনন্দের রেশ মিলিয়ে যেতে না যেতে আপনিই কোথা থেকে বেজে ওঠে বিষণ্ণতার বাঁশী, তখন জয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম এক পরাজয়ের বেদনা গুমরে গুমরে মরতে থাকে, যাকে প্রকাশ করা যায় না কারুর কাছে, অথচ তার ভার একাকী বহন করাও যায় না। রাজ্যলাভ করেও যে মহাপ্রস্থানের পথ বেছে নিতে হয়েছিল পাণ্ডুতনয়দের, তার পেছনে যে কাহিনীই থাক না কেন, সবার অন্তরালে ছিল এক দুঃসহ জীবন-সত্য, নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে আজ তা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারে দিব্যেন্দু।

জীবন সংগ্রামে আজ সে জয়ী। সাফল্যমাল্যেভূষিত ব্যক্তি। নিজস্ব বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, হাতে একটি সঞ্চিত কপর্দক পর্যন্ত নেই, এ অবস্থায় পৌঁছেও যারা বলতে পারে জীবন যুদ্ধে আমি জয়ী, জীবন আমার সফলতা অর্জন করেছে,—দিব্যেন্দু সেই অতি মুষ্টিমেয় মানুষদের মধ্যে একজন। না হলে যা ঘটেছে, তা কি ঘটতে পারত তার জীবনে? আর তা না ঘটলে, সে কি মুখোমুখি হতে পারত সেই প্রোজ্জ্বল সত্যের, যা আজ তার জীবনে ভাস্করের মতো দেদীপ্যমান?

সাংসারিক একটা ঘটনা বা বিপর্যয় যখন ঘটে যায় জীবনে, বিশেষ ভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায়, ঠিক একদিনেই সেটা ঘটেনি, তার অন্তরালে রয়েছে বহুদিন ধ'রে তিলে তিলে বর্ধিত এক বক্র স্রোত-ধারার গতিবেগ। পদ্মা নদীর মতো তলায় তলায় অগ্রসর হয়ে অকস্মাৎ সমস্ত ভিত্তিভূমি ধ্বসিয়ে দিয়ে কখন যে বিলুপ্ত করে দেয় বহু-আয়াসে অর্জিত সৌভাগ্যের কীর্তিসৌধ, তা অনেক সময় বুঝেই উঠতে পারে না মানুষ!

মা খুশি, বোনও খুশি, সেই একান্ত প্রবাস জীবনের দিনগুলি

একদিন সর্ববিধ খুশির আভায় রঙীন হয়ে উঠেছিল। সাফল্যমণ্ডিত মানুষ বলে কি সেদিনও তার মনে হয়েছিল, অন্ততঃ সেই মুহূর্তে ?

ওর বাবার এক জ্ঞাতিভাই, তাদেরই ব্যবসা ক্ষেত্রে। ভাই নেই, তাঁর ছেলেরা আজ মালিক। ওর বাবাকে বলেছিল, ও যদি কাজকম ঠিক মতো করতে পারে, কিছু ভাববেন না, ওর বাড়ি, এমন কি ভাগ্যে থাকলে গাড়ি পর্যন্ত আমরা করে দেবো। তাতে বাবার মনে কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল কে জানে। কিন্তু মা-র মনে যে উচ্চাশা মুক্ত বিহঙ্গের মতো নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে ডানা মেলে দিয়েছিল তাতে আর ভুল নেই।

তাই, এখানে দিব্যেন্দুর কাছে এসে যখন বাংলো-বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো মা আর ভাই, এবং আন্দাজ করতে লাগলো তার সর্বাঙ্গীন আয়ের অঙ্ক, তখন মনে মনে এ প্রশ্নও নিশ্চয় সেদিন তাদের মনে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, মাত্র একশো টাকা তাদের কাছে পাঠাতো কেন দিব্যেন্দু, কেন তার বেশি টাকা নয় ?

সেখানেই শেষ হলো না। মা ও বোন রয়েই গেল তার কাছে দুদিনের জন্য বেড়াতে এসে। ছোট ভাই নির্মলেন্দু কলকাতায় সামান্য একটা চাকরীতে ঢুকেছে সম্প্রতি, সে মা ও বোনকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে গেল কলকাতায় তার বাবার কাছে। এখানে চেনা দোকানটা থেকে শাড়ী-ব্লাউজ-ধুতি-প্যান্টের সমারোহ এসে গৃহস্বামীর মাহাত্ম্য বাড়াতে লাগল, অবশ্য ধারে। মা ও বোনের পাড়াপড়শী-গৃহ পরিভ্রমণ চলতে লাগল উজ্জ্বলতর ভঙ্গিমায়। এবং সেটা স্বাভাবিকও।

এই পরিভ্রমণের ফলই হচ্ছে,—অশোকা।

দিব্যেন্দুদের ব্যবসা যা,—তাকে অনেকটা ঠিকাদারী ব্যবসার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অফিস এবং ব্যবসার নিরস বর্ণনাগুলি দূরে সরিয়ে রেখে, সংক্ষেপে এ'কথা বললেই যথেষ্ট হবে, যে তাদের প্রতিযোগী যে অন্য বাঙালী ফার্মটি আছে, সেই ফার্মের মালিক পঞ্চানন মিত্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা—এই অশোকা মিত্র।

দীর্ঘাঙ্গিনী, দোহারা চেহারা। সুগঠিত, সুন্দর, সুঠাম নারীদেহ। কলকাতার কোনো কলেজে বি-এ পড়তে পড়তে হঠাৎ পড়া ছেড়ে দিয়ে হোস্টেল ছেড়ে চলে এসেছে বাপের কাছে। মুখশ্রী সুন্দর, চোখ-মুখ-নাক-ঠোঁট সবই সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে উচ্চ পর্যায়ে পড়ে। গায়ের রঙও ফরসা। মায়ের বর্ণনা মতো একেবারে 'ডানাকাটা পরী' না হলেও সুন্দরী বলা যেতে পারে।

দু-তিন দিন আলাপের মাধ্যমে প্রাথমিক জড়তাটা কেটে যাবার পরই, দিব্যেন্দুকে - 'আপনি নাকি ছবি আঁকতেন?' বলে আপ্যায়িত করেছিল অশোকা।

—বললে কে আপনাকে।

—আপনার বোন ঐন্দ্রিলা।

হেসে দিব্যেন্দু বললে—ওটা ওর নিজের দেওয়া নাম। আমাদের নাম—সুনন্দা, ডাকি 'খুকু' বলে।

অশোকা বললে—আহা, খুকু ত অনেকেরই নাম থাকে ছোট-বেলায়, সেটা আবার বলে বেড়ায় কে? আমার সামনে 'খুকু' বলে সেদিন ডাকলেন আপনি, ও লজ্জা পেয়ে পালাল।

দিব্যেন্দু বললে—আপনাকে আমার কাছে পৌঁছে দিয়ে আমার মা-বোন সব সময়ই ত পালিয়ে যায়, এটা লক্ষ্য করেন নি? দুজনকে একত্রে কথা বলতে দেওয়ার সুযোগই সব সময় খুঁজে বেড়ায় ওরা।

মুখখানা আরক্ত হয়ে ক্রমশ আরো রঙীন দেখাতে লাগল। গোধূলির আলো ঠিক সেই সময় মুখে এসে পড়েছে ওর, সেই যাকে বলে কনে দেখা আলো, সেই আলোতে ওকে এমন ভাবে দেখে মুগ্ধ হবে না, ভূ-ভারতে তেমন পুরুষ আছে কে?

অশোকা মুখ তুলে হঠাৎ বললে—আমি যাই।

দিব্যেন্দু বললে—যাবেন ত বটেই, এখানে চিরজীবনের জন্য যে আপনি থাকতে আসতে পারেন না, এ আমি জানি, কিন্তু তবু বলছি, একটু থাকুন। প্রবাসে থাকি, কাজ আর কাজ। এর মধ্যে, যে-

কারণেই হোক, যদি অকস্মাৎ এক ঝলক কাব্যের আলো এসেই পড়ে থাকে, ত একটু স্তুতি জানাতে দিন তাকে।

মুখ তুলে, দিব্যেন্দুর চোখের দিকে লজ্জা-বিজড়িত দৃষ্টিতে তাকিয়ে, মৃদুকণ্ঠে একটু ঝংকার দিয়ে বলে উঠলো অশোকা—কী যা'তা বলছেন আপনি।

দিব্যেন্দু বলে উঠলো,—অরণ্যে থাকি, স্বভাবে বন্য হবো এটা স্বাভাবিক। কিন্তু স্তুতিবাক্য যখন শুনতে রাজী নন, কাজের কথাটাই শুনুন?

—কী?

দিব্যেন্দু বললে—শাখা অফিসের কর্ণধার হিসাবে আমার এখানে সুনাম থাকলেও, পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মতো তা টলমল করছে। আমার মালিকরা আমার আত্মীয়, ছোট থেকে আমাকে দেখেছেন। এবং তাঁদের অপেক্ষা দুঃস্থতর রূপেই দেখেছেন আমাদের। এসব দেখার ফল সর্বত্র এক। যাদের দিকে এভাবে দৃষ্টি পড়ে, তাদের গুণাবলী চোখে ভেসে ওঠে না। কিন্তু, আপনার বাবা মিস্টার মিত্র প্রবীণ ব্যক্তি, অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, প্রতিযোগিতাও রয়েছে তীব্রভাবে আমাদের সঙ্গে, এক্ষেত্রে আমার যেটা গুণের দিক, সেটা তাঁর লক্ষ্য এড়িয়ে যাবার কথা নয়। তাঁর বয়স হয়েছে, তিন মেয়ের পরে একটি ছেলে, সেটি সবে আট বছরের। এ অবস্থায় আমাকে যদি কাছে তিনি পান, তাতে তাঁর লাভ বই ক্ষতি নেই।

দিব্যেন্দু হয়ত মনের আবেগে আরও কিছু বলে যেতো, কিন্তু মধ্যপথে বাধা দিলো অশোকা। মুখখানা তার বিবর্ণ-পাণ্ডুর হয়ে গেছে। কম্পিত কণ্ঠে বলে—থামুন দয়া করে। আপনার বক্তব্যের তাৎপর্য যে বুঝতে পারব না, এমন নাবালিকা আমি নই। শুনে, সর্বাঙ্গ আমার ঘৃণায় রী রী করছে। কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসিনি, একথা বিশ্বাস করতে পারেন।

বলেই আর দাঁড়ালো না, হন হন করে এগিয়ে গেল দরজার দিকে, তারপর ভেজানো দরজাটা খুলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। আর, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দরজা দিয়ে ঘরে এলো দিব্যেন্দুর মা, লাল পাড় একটা গরদের শাড়ি পরনে। বললে—কী সব বললি তুই ওকে! সব ভেঙে দিলি! আমার যে অনেক স্বপ্ন—

বাধা দিয়ে বিরস কণ্ঠে বলে উঠল দিব্যেন্দু—সে স্বপ্নের ছিন্নসূত্র আবার তুমি জোড়া লাগতে পারবে মা, এ বিশ্বাস তোমার এবং তোমার ঐন্দ্রিলার ওপর আমার চিরকাল আছে।

মা কতটা কী বুঝতে পারল কে জানে। অকস্মাৎ খুশির একটা হাসি ভেসে উঠল তার মুখে, বললে—তাই বল! তোর পছন্দ হয়েছে, কেমন?

দিব্যেন্দু বললে—মা, আজকাল বিয়ের ব্যাপারে বরপক্ষ থেকেই আগে প্রস্তাব যাওয়ার রেওয়াজ হয়েছে বুঝি?

মা বললে—ঈস, তা কেন? প্রতিমার কথা তোর মনে নেই? এত আসত বাড়িতে, এত মিশত, কখনো ওর জ্যেঠা-জ্যেঠির দিক থেকে কোন কথা আসেনি বলে, সে বিষয়ে সব চিন্তা আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম। এখানকার কথা আলাদা। অশোকার মা নিজে আমায় হাতে ধরে বলেছে। তবে আজকালকার ছেলেমেয়ে, নিজেদের মন নিজেরা তারা ভালো করে বুঝে নিক, এটা সে চায়।

যা এতদিন ভুলে ছিলো দিব্যেন্দু, মার কথায় হঠাৎ তা মনে পড়ে গেল। ওদেরই মতো মধ্যবিত্ত এক শিক্ষকের মা-মরা মেয়ে, প্রতিমা। অভাবের দরুন স্কুলের লেখাপড়াই শেষ করতে পারেনি, অথচ, পড়বার জানবার কী নিদারুণ আগ্রহই না তার ছিল!

মা-র সঙ্গে সেদিন আর ও বিষয়ে বাক্যালাপ না করে দিব্যেন্দু চলে গিয়েছিল অফিসের দিকে।

রাত্রে, অফিসের সবই বন্ধ, তবু এক জরুরী দরকার পড়েছে। 'কনফিডেনসিয়াল' ফাইল আর চিঠিপত্র নিয়ে সে বসে। বিশেষ করে,

টেণ্ডারের রেট্-ফেট্ যা কিছু হিসাব করে তৈরী করবার, তা তৈরী করে সে নিজে। এমন কি টাইপরাইটারে কাগজ পরিয়ে নিজেই টাইপ করে সে সব চিঠিগুলো। ওদের ক্লার্ক একজন মাত্র। চৌধুরী। চৌধুরী এসে ব্যবহৃত কার্বনগুলো উল্টে পাল্টে দেখে, লুকিয়ে লুকিয়ে যদি টেণ্ডারের অঙ্কগুলি আন্দাজে আন্দাজে ধরতে পারে। ধরতে পারলে অনেক সুবিধা, প্রতিপক্ষ মিত্তির সাহেবকে গিয়ে জানানো যায়। এবং সঠিক সংবাদ দিতে পারলে 'পুরস্কার'ও আছে।

এহেন চৌধুরী কিন্তু মালিকদের বিশ্বাসভাজন বেশী। দিব্যেন্দু তখনো যদি সতর্ক হতো, তাহলে তার জীবনের অতো বড়ো বিয়োগান্ত ঘটনাটি কখনই ঘটত না। অথচ মানুষ যে ঠিক অতোটা নীচে নামতে পারে, এ ধারণা সে একেবারেই করতে পারেনি। আর করতে পারেনি তারই আত্মীয়,—মালিক পক্ষের যে মূর্তি একদিন সে পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষ করেছিল,—তার কল্পনা!

ঐ যে ছবি আঁকতো সে এককালে,—আঁকার অনুশীলন অবশ্য আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু, যে মন তন্ময় হয়ে ছবি আঁকতো, সে মন? জোর করেই কি তার শ্বাস রোধ করে তাকে মেরে ফেলা যায়? মরেও সে মরে না। ভিতরে ভিতরে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হতে থাকে! তা যদি না হতো, তাহলে এই বিচিত্র সংগ্রামের কুরুক্ষেত্রে অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সে বিজয়ী হয়ে দাঁড়ালো কেমন করে?

আশ্চর্য কিন্তু মায়ের অধ্যবসায়! দিন ছয় সাত হয়ত গত হয়েছে, সেদিনটা রবিবার, এটা বেশ মনে আছে দিব্যেন্দুর। জানালার ধারে বসে দূর পাহাড় আর অরণ্যের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল সে। আকাশে অন্তিম শরতের শুভ্র আর লঘু মেঘ ভেসে ভেসে চলেছে, সকালবেলাকার হাওয়ায় অল্প অল্প শীতের আমেজ, এমন সময়, মা

আর বোন সঙ্গে করে নিয়ে এলো তাকে। সাধারণ সাদা একটা মিলের শাড়ি পরা, সতেজ সবুজ রঙের একটা ব্লাউজের ওপরে। মুখখানি ঈষৎ পাণ্ডুর, বিষণ্ণ!

ওকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো দিব্যেন্দু, বললে—বসুন?

—বোস মা, বোস।—বলে একটা বেতের চেয়ারে ওকে বসিয়ে দিয়ে মা বসল পাশে, বোনও এলো পাশের ঘর থেকে এঘরে। কিন্তু একথা সেকথার পরই যে ওকে ওর কাছে রেখে তারা একসময় নিঃশব্দে প্রস্থান করবে, একথা অজানা ছিল না দিব্যেন্দুর। হলোও তাই। প্রথমে মা 'আসছি' বলে চলে গেল। তারপর গেল বোন, 'চা করে আনছি' বলে চলে গেল।

বলে উঠল দিব্যেন্দু—রাগ তাহলে পড়ল আপনার?

মুখভার তার তখনো যায়নি, বললে—রাগ কীসের?

একটুক্ষণ থেমে থেকে, গম্ভীর কণ্ঠে দিব্যেন্দু বললে—সেদিন আমার কথায় মনে কিছু করেননি ত?

চোখ তুলে তাকালো, বললে—কতো কথা কতো লোকে বলে, সব কথাই যদি সবসময় ধরতে হয়, ত জীবনে পথ চলাই যে অসম্ভব হয়ে উঠবে!

দিব্যেন্দু বললে—সত্যিই খুশি হলাম আপনার কথা শুনে। একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন ত? আজকাল মানুষের কথায় আর কাজে একেবারে মিল নেই। মুখে কত আদর্শের কথা কিন্তু আচরণে তার লেশমাত্র নেই। কথার মূল্য যখন এই, তখন কথাকে বড়ো করে ধরবেন কেন?

অশোকার মুখে ফুটে উঠলো একটু হাসি, বললে—কী তাহলে বড়ো করে ধরতে বলেন?

—Moments—একটুও চিন্তা না করে উত্তর দিয়ে বসল দিব্যেন্দু—যখন যে মুহূর্ত আসে সেই মুহূর্তই তখন সব থেকে বড়ো। এই যে আপনি আমার কাছে একটু বসে আছেন, এই বসে থাকার

Momentই আমার কাছে এখন বড়ো। উল্‌টো পাল্‌টা যে কথাই বলি না কেন, সব তুচ্ছ।

লজ্জায় মুখখানা রাঙা হয়ে উঠল অশোকার। দিব্যেন্দুর মনে হলো, অশোকা যাই বলে উঠে দাঁড়াবে, উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে তার। তাকে ঈষৎ তীরস্কার করবে অশোকা, তারপর চলে যাবে, আর আসবে না সামনে।

কিন্তু না, অশোকা খুব নিম্ন কণ্ঠে মৃদু ঝংকারে বলে উঠল—হচ্ছে কী! মা রয়েছেন না পাশের ঘরে?

এবারে একটু চমকেই উঠল দিব্যেন্দু, তার মনে হলো, যেটা সে অতো হালকা ভাবে উড়িয়ে দিতে চায়, ব্যাপারটা অতো হালকা নয়। দুপক্ষের প্রশ্রয় মেয়েটির মনে রীতিমত এক প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করেছে বলতে হবে। যতোটা দৃঢ়চিত্তের মেয়ে বলে ওকে মনে করেছিল দিব্যেন্দু, ততটা দৃঢ়চিত্তের মেয়ে কি ও নয়? প্রশ্নটা নিজের কাছে করে নিজেই উত্তর পেয়ে গেল দিব্যেন্দু—পরক্ষণেই। তার মনে হলো দৃঢচিত্ততার প্রশ্ন এখানে আসে না, বিত্তবান ব্যক্তিব কন্যা, সংসারের যে একটা অতি রুক্ষ দিক আছে, তার সঙ্গে পরিচয় নেই বললেই চলে, তার মনে অকস্মাৎ অতি সহজেই যদি কোন স্বপ্ন সঞ্চার হয়ে থাকে ত তাতে অবাস্তব কিছু নেই। অপর পক্ষে, দিব্যেন্দু দুঃখ কষ্ট আর জীবন সংগ্রামের বহ্নিশিখায় ঝল্‌সে-যাওয়া মানুষ, তার মনে অত্যাশ্চর্য স্বপ্ন জেগে ওঠা খুব সহজ কথা নয়। কীসের উপর নির্ভর করে সে অশোকার পাণি গ্রহণ করবে? অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য একটু এসেছে অবশ্য, কিন্তু সেটা যে কোনো মুহূর্তে যে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে, সে খবর তার থেকে বেশী আর কে জানে!

অশোকা এই সময় হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো, বললে—আমি যাই।

সঙ্গে সঙ্গে কী এক অজ্ঞাত অনুপ্রেরণায় উঠে দাঁড়ালো দিব্যেন্দু, বললে—তাই চলুন।

অশোকা অবাক হলো ওর কথায়, বললে—কী বলছেন আপনি!

দিব্যেন্দু বললে—চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি ? চমৎকার নয় সকালবেলাটা !

বিস্ময়ে ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে গেছে অশোকার চোখ, বললে—আমি কি সেই কথা বললাম, আমি বললাম, আমি যাই। বাড়ি যাবার কথা বললাম।

দিব্যেন্দু বললে—মাপ করবেন, আপনাদের বাড়ি আমি এখন যেতে পারব না। চৌধুরী টের পাবে, সঙ্গে সঙ্গে সে চিঠি লিখবে কলকাতায়—আমাদের হেড-অফিসে—আমাদের মালিক আমার জ্যেঠতুতো ভাইদের কাছে। তাতে দাঁড়াবে এই যে, আমাদের প্রধানতম প্রতিযোগী মিস্টার মিত্রের সঙ্গে গোপনে যোগদান করে এ ফার্মের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি।

অশোকা বোধহয় এতক্ষণে কৌতুক বোধ করছে ওর কথায়, সে অল্প একটু হেসে বললে—আমি তা-ও বলিনি। আমি একাই এখন চলে যাবো, সেই কথা বলছিলাম।

দিব্যেন্দু বললে—একা একা যে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না আপনাকে। দেখছেন না, আকাশে কেমন আজ ছুটির বাঁশী বেজে উঠেছে ? চলুন না একটু সুবর্ণরেখার ধারে গিয়ে বেড়িয়ে আসি ? অবশ্য, আপনার যদি খুব আপত্তি না থাকে।

অশোকা মুখ নীচু করে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলো, তারপরে মুখ তুলে, অনুচ্চকণ্ঠে বলে উঠল—আজ নয়। একটু ভাবতে দিন।

—কেন, এ বিষয়ে ভাববার কী আছে। আমাকে বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না বুঝি ?

মৃদু হাসি ফুটে উঠল অশোকার ঠোঁটের প্রান্তে, বললে—বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়।

—তবে ? আমার সঙ্গ আপনার কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠবে ?

এবার স্পষ্টতই হেসে ফেলল অশোকা, বললে—তা কেন ? আপনার সঙ্গ দেখছি—ইনটারেস্টিং।

যেন আশ্বস্ত হলো দিব্যেন্দু, বললে—বুঝেছেন ত? তাহলে আর আপত্তি করছেন কেন?

অশোকা তেমনি অনুচ্চকণ্ঠে বললে—আপনিই বা অতো আগ্রহ প্রকাশ করছেন কেন?

দিব্যেন্দু বললে—তাহলে দেখা যাচ্ছে এটাও বুঝেছেন, আমার আগ্রহ প্রচুর। কিন্তু, কেন যে আগ্রহ, সেটাই ত আপনাকে বলতে চাই, তবে এখানে নয়, নিরিবিলিতে। আর এখানকার সুবর্ণরেখার তীর জানেন ত? একেবারে নিরিবিলি।

অশোকার মুখখানি আবার লাজারুণ হয়ে উঠল, সে বললে—জানি আপনি কী বলবেন।

—কী বলব!

—জানি না যান! —বলে অশোকা প্রায় ছুটেই চলে গেল দরজার দিকে। যেতে যেতে একসময় ফিরে দাঁড়ালো, বললে—ছুদিন সময় দিন, কেমন?

কোনক্রমে কথাটা বলে ফেলেই ছুটতে লাগল অশোকা, তার নিজের বাড়ির দিকে। আর, প্রথমটা অবাক হয়ে একভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেও, পরে, ব্যাপারটার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম মাধুর্যের সন্ধান পেলো দিব্যেন্দু। এতে মুগ্ধতা আসা স্বাভাবিক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে একটু আতঙ্কিত হয়ে ওঠে সে। একবার ভাবল, এইতো বেশ, যা অতীতে শেষ হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর টানাটানি কেন? বরং যে ঘটনাস্রোত আসন্ন হয়ে উঠেছে, তাতেই গা ভাসিয়ে দিয়ে ভেসে চলা যাক। অশোকা ত সত্যিই অপছন্দের মেয়ে নয়! ও ঘরে এলে মা-ও সুখী হবে মনে হয়, ভাই আর বোনও সুখী হবে, এক বাবার কথা বলা শক্ত। বাইরে থেকে অত্যন্ত সাধারণ মানুষ বলেই মনে হয়, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে অদ্ভুত এক আদর্শবাদ ক্রিয়া করে চলেছে। মুখে হয়ত কিছুই বলবেন না, কিন্তু চোখ তুলে এমন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাবেন,

যাতে মনে হবে তিনি বলতে চাইছেন—শেষ পর্যন্ত তুইও হার মানলি!

অপর পক্ষে অশোকাকে ঘরে আনা মানে, জ্ঞাতিদের নিগড় ছেড়ে বেরিয়ে পড়া। চৌধুরীর সুগোপন দৌত্যের ফলে তাঁদের দিক থেকে যে সন্দেহের ভ্রূকুটি মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়, সে আবিলতা থেকে অন্ততঃ মুক্তি পেতো দিব্যেন্দু। তারপর পড়ত গিয়ে বিচক্ষণ ব্যবসায়ী পঞ্চানন মিত্রের কর্মাবর্ত চক্রের কক্ষপথে। এবং তার ফলে, অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য যে আরও প্রসার লাভ করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অর্থাৎ এককথায় অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা।

ভালোই হয়েছে, দুদিন সময় নিয়েছে অশোকা। তা না হলে, যে-কথা সে বলতে চেয়েছিল, তাতে কী আকস্মিক বিপর্যয় যে সৃষ্টি হতো, কে জানে! কিন্তু আবার এটাও জিজ্ঞাস্য, দিব্যেন্দু তাকে কোনো কথা বলতেই বা চেয়েছিল কেন? প্রথম থেকেই একটা অটল গাম্ভীর্যের প্রাকার তুলে অনায়াসেই পার হতে পারত এই উত্তাল তরঙ্গ থেকে। মাকে ডেকে সে দৃঢ় কণ্ঠেই দিতে পারত সংক্ষিপ্ত উত্তর—না।

কিন্তু না, তা সে পারেনি। নিরুদ্ধ যৌবন তার ভিতরে ভিতরে হাহাকার করে ফিরছে, অশোকার সঙ্গ লাভ করে সহজেই সে যৌবন 'না' বলে উঠতে পারেনি! পারলে ত সব-কিছুই হয়ত সহজ হয়ে যেতো। অথচ না পারার ফলে ব্যাপারটা বোধহয় আরও জটিল হয়ে গেছে।

পরদিন, অফিস ঘরে সে বসে আছে, বিকেলের দিকে হবে সময়টা, অফিস তখন পুরোপুরি ছুটিও হয়নি, অতি অকস্মাৎ ঘরে এসে প্রবেশ করলেন পঞ্চানন মিত্র, যিনি নাকি কোনদিন এর আগে পদার্পণ করেন নি ওদের অফিস-প্রাঙ্গণে। বাইরে থেকে সাড়া দিয়েই ঢুকলেন তিনি ঘরে। বাইরে থেকেই প্রথম শোনা গেল তাঁর গম্ভীর, ধারালো কণ্ঠস্বর,—দিব্যেন্দু আছো?

তাঁকে দেখে চৌধুরীর মুখখানা কেমন পাংশু হয়ে উঠলো, দিব্যেন্দুও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল ওঁকে সম্মান দেখাতে। উনি সবার দিকেই একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করে নিয়ে বলে উঠলেন—ও, অফিস এখনো চলছে বুঝি। ঠিক আছে, আমি গিয়ে বসছি তোমার ঘরে, তোমার মায়ের কাছে।

চলে গেলেন তিনি, দিব্যেন্দু খুব যে চিন্তাগ্রস্ত হলো তা নয়। সে জানে, মা আছে, পঞ্চানন বাবুর অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হবে না। অফিস বন্ধ ক'রে, হাতের কাজগুলি শেষ করে বসবার ঘরখানিতে আসতে আসতে তার কেটে গেল আরও আধ ঘণ্টা। ততক্ষণে মা আর বোন পঞ্চাননবাবুকে জলযোগ দ্বারা আপ্যায়নকার্য সমাপ্ত করে ফেলেছে।

তাকে দেখে তার দিকে মুখ ফেরালেন পঞ্চাননবাবু, বললেন—এই যে দিব্যেন্দু। কয়েকটা কথা আছে জরুরী। বোসো।

সে নিরুত্তরে আসন গ্রহণ করা মাত্রই মা ও বোন একে-একে চলে গেল অন্য ঘরে। পঞ্চাননবাবু যাকে বলে সেল্ফ মেড ম্যান,—সেই ছোট বয়স থেকে ব্যবসায় লেগে থেকে আজ এত বড়োটি হয়েছেন বলে শোনা যায়। লোকটি কথাবার্তায় যে সোজাসুজি প্রকৃতির লোক, তা দিব্যেন্দু আগেই জানত। এখানকার ব্যবসায়ী-দের যে অ্যাসোসিয়েশন আছে, তার সভাগুলিতে ওকেও যেতে হয় মালিকদের প্রতিনিধি হিসাবে, সেখানেও সে দেখেছে মিত্র মহাশয়ের কার্যকলাপ। ভাষণে কোনো ভূমিকা নেই, একেবারে সোজাসুজি বক্তব্য-বিষয়ে অবতরণ, এই-ই হচ্ছে ওঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বার করে একটা সিগারেট নিলেন পঞ্চাননবাবু, সেটি ধরিয়ে দু'একবার টান দিয়ে বলে উঠলেন—শোনো দিব্যেন্দু। তোমাদের কেরানী ঐ চৌধুরীকে তোমার কেমন মনে হয়?

দিব্যেন্দু অল্প একটু হেসে বললে—কেন? ভালোই ত।

—না—পঞ্চাননবাবু বললেন—ভালো লোক সে যে নয়, এ তুমিও জানো। আমার কাছে স্বীকার করতে চাইছ না। কিন্তু, সে যাই হোক, আমি শুধু এইটুকু বুঝেছি, তোমার মালিকরা তোমার আত্মীয় হলেও, শেষ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে তাদের বনিবনা হবে না। কী বলো?

মুখ নীচু করে দিব্যেন্দু শুনছিল কথাগুলি। ওঁর প্রশ্নে মুখ তুলে বললে—আমার মতামত থাক! আপনার মতামতই শুনতে চাই।

হেসে উঠলেন মিত্র মশাই, বললেন—তাহলে পাকা মাথার দাম আছে বলো! বেশ-বেশ!

—আপনি বলুন।

উনি শুরু করলেন ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে—আমি বলি কী, তুমি আমার ফার্মে চলে এসো। তুমি আমার চেয়ে বয়সে ঢের ছোট, ছেলের মতো বললেও অত্যুক্তি করা হবে না, কিন্তু তোমার বুদ্ধিকে আমি শ্রদ্ধা করি। তোমাকে পেলে আমাদের ফার্ম আরও বড়ো হয়ে উঠবে, এ আমার স্থির বিশ্বাস। দেখছ ত আমাকে? বয়স হয়ে গেছে, তেমন আর খাটতে পারি না। তুমি এলে—

উনি থামতেই বলে উঠল দিব্যেন্দু—কিন্তু, প্রস্তাব আপনি করছেন কী ক'রে? আমি—মানে—

মিত্র মশাই বললেন—বুঝতে পারছি তোমার দ্বিধা। তুমি আমার ফার্মে এসে কর্মচারী হবে না, পার্টনার হবে, ওয়ার্কিং পার্টনার।

একটু চমকেই উঠল সে, এবার বললে—এ আপনি বলছেন কী!

উনি বললেন—অনেক ভেবে-চিন্তেই বলছি। তোমার মার সঙ্গেও কথা হচ্ছিল। আসল কথা কী জানো? আমার বড়ো মেয়ে—অশোকা—ওকে ত দেখেছ? বড়ো হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, একটা নিজস্ব মতামতও গড়ে উঠেছে ওর। যুগটা স্বাতন্ত্র্যের যুগ বলেই ওর ওপর কোনো কিছু জোর করে চাপিয়ে দিতে চাই না। আমি বহুদিন থেকেই তোমার সম্বন্ধে আমার এই গোপন আশা মনে

মনে পোষণ করে আসছি। তোমার কর্মদক্ষতা ও বুদ্ধি আমায় মুগ্ধ করেছে বললেই চলে। আমি তোমাদের প্রতিযোগী, সেই হিসাবে তোমাদের ফার্মকে আমি হিংসা করি। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তোমাকে নয়। তোমাকে যদি নিজস্ব ক'রে আমি কাছে পাই, তাহলে আমার সমস্ত আকাঙ্খাই সফল হয়। আমি আমার মেয়ের মন জানি, এ প্রস্তাবে সে অরাজী হবে না। এখন তুমি কী বলো? তোমার কী মত?

গম্ভীর হয়ে বসে রইল দিব্যেন্দু নিরুত্তরে। কিছুক্ষণ উত্তরের প্রত্যাশায় থেকেও যখন কোনো সাড়া পেলেন না পঞ্চাননবাবু, তখন নিজেই আবার বলতে শুরু করলেন—ঠিক আছে, মনস্থির করে পরেই আমাকে জানিও। এর পরে অন্যান্য দু'একটি কথা বলেই সেদিনের মতো বিদায় নিলেন পঞ্চাননবাবু। কিন্তু, যে কথা দিব্যেন্দুর মনে গুঞ্জন করে ফিরতে লাগল, সে হচ্ছে এই—'এ প্রস্তাবে আমার মেয়ে অরাজী হবে না।'

সে রাতটা যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটেছিল দিব্যেন্দুর। অশোকার হাসি-হাসি মুখখানা বার বার ভেসে উঠতে লাগল মানসপটে। মাথায় আঁচল টেনে ঘোমটা যখন সে দেবে, সিঁথিতে দেবে সিঁদুর, আর হাতে লোহা আর শাঁখা, তখন কেমন দেখাবে অশোকাকে? যেন রাজেন্দ্রাণী। মা এসে বৌকে আদর ক'রে ঘরে তুলে নেবে, বোন এসে সাজিয়ে দেবে তাকে। মা তাকে নিয়ে বেরুবেন এবাড়ি-ওবাড়ি, বলবে—এই দেখ, কী সুন্দর বউ এনেছি আমি!

আর দিব্যেন্দু? পি মিত্র এণ্ড কোম্পানির অন্যতম অংশীদার হয়ে পুরোপুরি ব্যবসায়ী হয়ে গেছে। ফরেস্ট অফিসার, রেঞ্জার আর গার্ডদের সঙ্গে তার ঘোরাঘুরি। ফরেস্ট ইজারা নেওয়া, নানা রকম গাছের সন্ধান, কাঠ কাটা আর চেরাই করা; তারপর আছে রেলওয়ে সাইডিংয়ের ব্যাপার, ওয়াগনের আমদানী, স্টেশনের এস্-এম্

এ-এস্-এম্ থেকে শুরু করে গুড্‌স ক্লার্ক পর্যন্ত, সবার সঙ্গেই বন্ধুত্ব বজায় রাখা, তাদের সঙ্গে তাদের মনোমত কথা বলা, দরকার হলে এ-এস্-এম্ ব্যানার্জীর কোয়ার্টারে যে সান্ধ্য তাসের মজলিস বসে, তাতে যোগদান করে 'থ্রি নোট্রাম্প্‌স্' বলে চীৎকার করা। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 'টেণ্ডার' পাঠানো এবং তার তদ্বির করা, এসব ত আছেই!

অর্থাৎ এক কথায় দিব্যেন্দুকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেবে সংসার। কথা হচ্ছে, তাই ত সকলকে নেয়, এই ভাবে নিজেকে গ্রাস হতে দেওয়াই ত আরামের, এবং সেটাই ত স্বাভাবিক!

কিন্তু লাখে একজনও মেলে না যে প্রকৃতির-মানুষ, দিব্যেন্দু সেই বিরল প্রকৃতিসম্পন্ন মানুষদেরই বোধহয় একজন। নইলে, পরবর্তী অবকাশে, অশোকা যখন আবছা নীল রঙের বুটিদার শাড়িখানি পরে তার সঙ্গে দেখা করতে এলো, এবং এলো শুধু নয়, উভয় পক্ষীয় অভিভাবকদের প্রচ্ছন্ন সম্মতির আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পাশাপাশি হেঁটে একেবারে নির্জন সুবর্ণরেখার তীরে বেড়াতে গেল, তখন যে অদ্ভুত আচরণ তার সঙ্গে করেছিল দিব্যেন্দু, তাতে আর সাধারণ পুরুষ মানুষের সঙ্গে তাকে মেলানো যায় না। ঘটনাটা একটু আগে থেকেই বিবৃত করা যাক।

অপরাহ্ণের পড়ে-আসা রৌদ্র নদী-তীরবর্তী শালবৃক্ষের পাতায় পাতায় ঝিলমিল করছে, সুবর্ণরেখার সোনালী বালুচরে ধবধবে সাদা বকেরা বসে আছে অসীম স্থৈর্য নিয়ে, ওপারে প্রান্তর দিয়ে একপাল মোষ নিয়ে গাঁয়ের দিকে ফিরে চলেছে সাঁওতালী ছেলে, কিছুটা দূরে খেয়াঘাটটি ধূ-ধূ চোখে পড়ে, বর্ষায় নদী ভরে গেলে যে ঘাটে নৌকা বাঁধা থাকে, সেই ঘাট দিয়ে খোঁপায় ফুল পরা সাঁওতাল মেয়েরা মাথায় ঝক্‌ঝকে পিতলের বাটি আর ঘটি বসিয়ে পরনের কাপড় প্রয়োজনমত হাঁটু পর্যন্ত তুলে সার বেঁধে পার হয়ে যাচ্ছে সুবর্ণরেখা! সমস্তটা মিলিয়ে অপূর্ব এক সুর, অদ্ভুত এক ছবি। অশোকার মন ভরে গেল,

ফুটি তরুণী-চোখ বিস্ময়ে, আনন্দে আরও প্রদীপ্ত দেখালো। বলে উঠলো—বাঃ!

দিব্যেন্দু তাকালো ওর দিকে, বললো—কী বাঃ! নদীতীরের দৃশ্য, না, আমি?

ওর চোখ দুটি সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় নত হয়ে এলো, মুখে ফুটে উঠল মৃদু একটু হাসি, আর ঠিক সেই সময়, সুদূর পাহাড়ের চূড়ার পিছন থেকে অস্তগামী সূর্যের আভা এসে পড়ল ওর মুখের ওপর! যাকে বলে গোধূলি বেলার আলো, কনে-দেখা আলো! একে ও সুন্দরী, তার ওপর এই অপূর্ব পরিবেশ, মুনিগণ যে কালে ধ্যান ভেঙে দেয় পায়ে তপস্যার ফল, এ সেই কাল, সেই লগ্ন!

দিব্যেন্দু সব ভুলে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। সে মধুর বিস্মৃতি এসেছিল অশোকারও, সে-ও সব ভুলে বুঝি তাকিয়েছিল দিব্যেন্দুব দুটি বিমুগ্ধ চোখের দিকে, কয়েক মুহূর্ত। তারপব অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠেছিল—বাঃ।

নদীতীরের একটা টিলার ঢালুতে ওরা বসেছিল। বড়ো একটা গৈরিক পাথরের ওপবে। একটা মানুষের হাতের আঙুলও যে এত সুন্দর হতে পারে এ যেন সেদিন নতুন আবিষ্কার করেছিল দিব্যেন্দু। ওর হাঁটুর কাছে অশোকার একখানা হাত পাথরের ওপর ভর দেওয়া আছে, হাতের সরু দুগাছি চুড়ি একটির ওপর আরেকটি যেন অসীম মমতায় বিলগ্ন হয়ে আছে, আর অশোকার সরু সরু আঙ্গুল ছুঁয়ে আছে গৈরিক পাথর। সে ছুঁয়ে থাকার যেন এক বাণী আছে, এক অনুচ্চারিত মধুরতম বাণী! হঠাৎ ওর দিকে ফিরে বসে, হাত বাড়িয়ে সেই আঙুলগুলিই অধিকার করে বসল দিব্যেন্দু, কিসের আবেগে যেন তার সারা অন্তর চুরমার হয়ে যাচ্ছে, বলে উঠল—অশোকা!

একটু চমকে উঠলেও, তার হাতের মধ্যে হাতখানি রেখে স্থির হয়ে বসে আছে অশোকা। নত মুখখানির চিবুকের রেখায় দিনের শেষ আলো রেখে যাচ্ছে যেন তার শেষ স্পর্শ, বলে যাচ্ছে, ওগো আসি!

এ যেন আরেক জগতের মেয়ে, হঠাৎ এখানে এসে অশোকা নাম নিয়ে বসে আছে তার পাশটিতে, মুছে দাও ঐ নাম, মুছে দাও ওর সব অস্তিত্ব, প্রদীপের শিখার মতো একটি আলোক-রেখা অমনি জ্বলে উঠে বিলীন হয়ে যাবে ঐ শেষ সূর্যের রশ্মিজালের মধ্যে।

নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি ওর বন্দী হাতের মুঠিতে আরও একটু চাপ দিলো দিব্যেন্দু। বলে উঠল—অশোকা?

খুব অস্ফুট, সেতারের তারের একটা মাত্র ঝংকারের মতো সাড়া এলো,—কী!

—আমি তোমাকে যা বলতে চেয়েছিলাম, তা আর বুঝি বলা হলো না—অশোকা!

মুখখানি পরিপূর্ণ ওর দিকে তুলে ধরে অশোকা, দুটি চোখে জেগে উঠল যেন এক নীরব প্রশ্ন—কী? কী বলতে চেয়েছিলে?

দিব্যেন্দু বলতে লাগল—কেন জানি না, মনে হচ্ছে, সব থাক, সব-কিছু পিছনে পড়ে থাক, তোমাকে শুধু শুনিয়ে যাই একের পর এক কবিতা; মনের মধ্যে যে কথাগুলি এখন জেগে উঠছে, সে সবই ছন্দে ছন্দে বলে যেতে ইচ্ছা করছে তোমাকে।

—বলো।

কী যে অপূর্ব শোনালো এই অতর্কিত 'তুমি' সম্বোধন। দিব্যেন্দু ওর ধরা হাতখানাই আর একটু আকর্ষণ করলো নিজের দিকে। আর মনে হলো, এক প্রস্ফুটিত পুষ্প-বৃন্ত বুঝি তার সব ফুল আর পাতা নিয়ে ঢলে পড়ল তার বাম কাঁধটির ওপরে। কান্নার মতো সুরে বলে উঠল অশোকা,—এমন করে টানলে কেন?

—জানি না। আমি এসব চাইনি।

—কী চাওনি?

—এই সব। তোমার বাবা এসেছিলেন।

—জানি।

—আমাকে তোমার—তোমার ভালো লেগেছে?

অশোকা তার বাম বাহুর ওপরে কপালটা রেখে, প্রমত্তার মতো বলতে লাগল—লেগেছে গো, লেগেছে !

—কেন ?

—তা জানি না, তুমি একটু অন্য ধরনের মানুষ বলে হয়ত।

ওর চিবুকে হাত দিয়ে মুখখানি তুলে ধরল দিব্যেন্দু, বললে—সব কিছু আমার পাল্‌টে দিলে কেন ?

সোজা হয়ে বসে কৃত্রিম বিস্ময়ে বলে উঠল অশোকা—ওমা আমি !

—নয় !—দিব্যেন্দু এক মুহূর্ত থেমে থেকে তারপরে বললে—অথচ, জানো কি তোমাকে কী বলতে চেয়েছিলাম ? বলতে চেয়েছিলাম, এ হয় না অশোকা, এ হয় না। তোমাকে ভালবেসেও এ হয় না।

—কী হয় না !

—বিয়ে !

যেন পাথরের এক প্রতিমার মতো স্থির হয়ে গেল অশোকা। সূর্য বিদায় নিয়ে গেছেন দিগন্ত থেকে, আকাশে মেঘে মেঘে শুধু জেগে আছে তার আরক্তিম শেষতম স্মৃতিচিহ্ন ! কিন্তু এ-ও মুছে যাবে। প্রকৃতির মধ্যে এখন এক কৃষ্ণ বসন পরিহিতা অভিসারিকার প্রচ্ছন্ন পদবিক্ষেপ আসন্ন হয়ে উঠেছে !

দিব্যেন্দু বললে—তোমাকে পাওয়ার অর্থ, ব্যবহারিক জীবনে পূর্ণ সাফল্য অর্জন। আর, মানুষ ত তা-ই চায়। বিশেষ করে আমার মতো অবস্থার মানুষ। আমার মালিকদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ যে অবশ্যম্ভাবী, সে আমি জানি। জানি বলেই এ প্রস্তাব হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করা ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই। মাকে সুখী করতে হবে, বোনের বিয়ে দিতে হবে। কলকাতায় ছোট ভাই আছে, বাবা আছেন। ছোট ভাই অবশ্য একটা চাকরী করে, কিন্তু বাবাকে এখন তাঁর শিক্ষকতা থেকে বিদায় গ্রহণ করাতে পারলে ভালো হয়।

এতক্ষণে যেন প্রাণ ফিরে এলো পাষাণ প্রতিমার মধ্যে, বললে—তা এই সবই ত পুত্রের কর্তব্য।

—নিশ্চয়ই।

অশোকা বললে—আমি একটা কথা বলব?

—বলো?

বললে—বাবা যা বলছেন তাই করো। তোমার ভালই হবে।

ওর হাতখানি আবার হাতের মধ্যে তুলে নিলো দিব্যেন্দু, বললে—তা আর জানি না! কিন্তু এবার তুমি বলো, তুমি সুখী হবে?

একটু বোধহয় হাসল অশোকা, সেতারের তারের ঝংকারের মতো শোনা গেল ওর হাসি। বললে—হবো না কেন?

দিব্যেন্দু বললে—স্বামী যদি তার শ্বশুরের অফিসে কাজ করে, তাহলে শ্বশুর-কন্যার মনের অবস্থা কী হয়?

অশোকা বললে—ও, এইসব চিন্তা করছ? আমার বাবা সে-রকম লোকই নয়। তুমি সত্যিই ওঁর স্নেহ পাবে।

—'পাব' কেন, হয়ত পেয়েছি।—দিব্যেন্দু বললে—কথাটা তা নয়, তোমার চোখে আমি হীন হয়ে যাবো না ত?

—আহা! কী কথাই বললেন!

দিব্যেন্দু তবু বললে—সংসার বড় বিচিত্র জায়গা! আমি অনেক দেখেছি অনেক সহ্য করেছি বলেই বলছি। তুমিও কারুর কাছে হীন হয়ে যাবে না ত?

—ছিঃ, তা কেন?—অশোকা বললে—তুমি ত আলাদা বাসা করবে। আমি কি বাপের বাড়ি পড়ে থাকবো নাকি?

—ব্যস, একটা সমস্যার সমাধান হলো!—দিব্যেন্দু বললে—বধূজীবন তোমার ভালো লাগবে?

এবারে খিল খিল করে হেসে উঠল অশোকা, বলল—আচ্ছা পাগল লোকের পাল্লায় পড়েছি ত? এবারে ওঠো, সন্ধ্যা হয়ে গেল!

চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিলো দিব্যেন্দু। সন্ধ্যা হয়েছে সত্যিই, কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে একটা বিচ্ছুরিত আলোর বিভা এমন করে চারিদিক ঘিরে থাকে নাকি? হয়ত থাকে, এ-ও আজ প্রথম আবিষ্কার দিব্যেন্দুর কাছে। সে ছেলেমানুষের মতো ওর হাত দুটি ধরে বলে উঠলো—লক্ষ্মীটি, আর একটু থাকো।

অশোকা মুখ টিপে হেসে বললে—থাকি। তা বলে 'আর একটু'কে সীমাহীন করো না যেন।

—না, তা করব না!—বলে, দিব্যেন্দু করলো কী, ছেলেমানুষের মতো হঠাৎ শুয়ে পড়ল অশোকার কোলে মাথা রেখে।

—এ কী!

—চুপ। কথা কয়ো না। শুয়ে শুয়ে তারা দেখব।

তারার কথায় অশোকাও মুখ তুলল আকাশের দিকে। বললে—কটি তারা উঠেছে বলো ত? এক, দুই, তিন—ওমা আর তারা কই? চার তারা না দেখে ঘরে ফিরতে নেই যে! হ্যাঁ দেখেছি, ঐ যে চার। ঐ পাহাড়ের মাথার কাছে। দেখ?

—না।

অশোকা আশ্চর্য হয়ে বলল—কী না?

দিব্যেন্দু বললে—মিথ্যে কথা। চার তারা ওঠেনি।

—ওমা! ঘরে না ফেরবার মতলব, না? চোখ তুলে দেখ, চার কেন পাঁচ, ছয়, সাত, অনেক তারা উঠে গেছে।

—বাজে কথা। মাত্র দুটি তারা উঠেছে।

—মানে!

দিব্যেন্দু বললে—এই যে আমি তাকিয়ে আছি দুটি তারার দিকে। আর তারা কই?

এইবার বুঝতে পারল অশোকা, আর বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ লজ্জা আর অজানা এক আনন্দ যেন মুহূর্তে আচ্ছন্ন করে ফেলল ওর অন্তর, বলে উঠল—যাও!

বলল বটে, কিন্তু চোখও ফেরাতে পারল না। কী এক অদ্ভুত দৃষ্টি ফুটে আছে দিব্যেন্দুর দুটি চোখে, বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে—( তাদের সাবেক দেশের বাড়ির দিকে যেতে পথের দুপাশে সে দৃশ্য দেখেছিল অশোকা )—ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত্রে ঝিলের বুকে যেমন করে ফুটে থাকে উৎফুল্ল কুমুদ কহ্লার!

নিজের অজ্ঞাতসারেই বুঝি তার মুখখানা চাঁদের আলোর মতো ধীরে ধীরে নেমে আসছিল একটি কুমুদ ফুলের ওপরে, এমন সময় মাথা তুলে ধড়মড় করে হঠাৎ উঠে বসল দিব্যেন্দু, বললে—এবার চলো, তারা ফুটে গেছে।

কোন কথা বলল না অশোকা, দুটি বিস্ফারিত চোখ মেলে শুধু তাকিয়ে রইল দিব্যেন্দুর দিকে।

নিজে উঠে দাঁড়িয়ে, ওর হাত ধরে টান দিলো দিব্যেন্দু, বললে—উঠবে না?

ও উঠে দাঁড়ানো মাত্রই ঘটে গেল সেই পরম আকাঙ্খিত ঘটনা, অতি অকস্মাৎই ঘটে গেল। শুধু দুটি চোখের তারার সঙ্গে দুটি চোখের তারার দৃষ্টিপাতের মিলনই নয়, অতর্কিতে দুটি বিদ্যুৎ-রেখার মিলন।

সঙ্গে সঙ্গে ওরা ছিটকে সরে গেল দুদিকে। আবার পাশাপাশি এসে টিলা থেকে নেমে পথ চলতে লাগল বটে, কিন্তু নীরব হয়ে গেছে দুটি কণ্ঠ, মৌন হয়ে গেছে দুটি মন।

এই আকস্মিক বিদ্যুৎস্পর্শের বোধহয় প্রয়োজন ছিল, নইলে, যে প্রতিক্রিয়া ঘটল একটু পরেই সেটা ঘটত না। আলোকিত রাজপথে ওঠবার আগেই একটা ঝাঁকড়া মাথা গাছের তলায় ওরা দাঁড়িয়েছিল দুজনে। দিব্যেন্দুই কথা বলেছিল প্রথমে। বলেছিলো—শোনো?

—কী?

—এ বোধ হয় ভালো হলো না।

—কী ?

দিব্যেন্দু বললে—এই ভালোবাসাবাসি।

ধীর অস্ফুটকণ্ঠে অশোকা বললে—ভালমন্দ ভেবে কেউ ভালো বাসে নাকি ?

—না, তা বাসে না,—দিব্যেন্দু বললে—বাসতে পারে না বলেই যে আচরণ করব না ভেবেছিলাম, সেই আচরণ করে বসলাম। যা বলব না বলে ভেবেছিলাম, তাই বলে বসলাম।

—অনুশোচনা হচ্ছে নাকি ?

—না তা ঠিক নয়,—দিব্যেন্দু বললে—তবে একটা গ্লানিবোধ মনকে শেকলের মতো পাকে পাকে যে বেঁধে ফেলছে, একথা অস্বীকার করি কী করে ?

অশোকা একটু হাসল, বললে—আচ্ছা লোককে নিয়ে আমি ঘর বাঁধতে চলেছি !

বলেই, প্রদীপ্ত, সপ্রেম দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকালো অশোকা, বললে—পাগল !

দিব্যেন্দু বললে—এইখানে, এই গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ কথা বলবে অশোকা ?

অশোকা বললে—কেন, এখনো সখ মিটল না। খোঁজ নিয়ে দেখ, সারা বাঙালী পল্লী এতক্ষণে কানাকানি করতে আরম্ভ করেছে তোমাকে আমাকে নিয়ে।

—সেটা সম্ভব। কয়েকঘর বাঙালী মাত্র রয়েছে এখানে, এই ভিন্ন প্রদেশে। একে যে অপরের খবর নিয়ে কানাকানি করবে, এতো স্বাভাবিক কথা। ভয় করলে চলে ?

—ভয় করছে কে ? করলে কি তুমি ডাকা মাত্রই এমন করে ছুটে আসতাম ?

দ্বিগুণ আবেগে বলে উঠল দিব্যেন্দু—সত্যি বলো, ভালবেসেছ আমাকে ?

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারল না অশোকা। ওর কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল, যাতে একটু যেন অবাকই হলো অশোকা, বললে—এতক্ষণ—এত ব্যাপারের পর—এ প্রশ্ন কেন?

—বলবে না!—দিব্যেন্দু উন্মত্তের মতো বলতে লাগল—আমার জীবন-মৃত্যু সব নির্ভর করছে এর উত্তরের ওপরে।

—একটা সামান্য মেয়ের কথার ওপরে?

—যদি বলি তাই।—দিব্যেন্দু বলতে লাগল—বেশ ছিলাম এতক্ষণ, যেন স্বপ্নের রাজ্যে বিলীন হয়ে ছিলাম। কিন্তু যতো সংসারের নিকটবর্তী হচ্ছি, ততই মনে হচ্ছে সংসার ছুটে আসছে নিদারুণ বেগে আমার দিকে, প্রবল স্রোতের মুখে তৃণের মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাবে!

অশোকা সস্নেহে বললে—এই কি পুরুষের মতো কথা হলো?

—হলো না, তা আমি জানি।—দিব্যেন্দু বললে—তাহলে সব কথা তোমাকে শুনতে হবে। অদূরের ঐ আলোকিত পথ ধরে কে আসে যায় দেখলে চলবে না, কে আমাকে তোমাকে একসঙ্গে দেখলো এও লক্ষ্য করলে চলবে না, কতো মিনিট কতো ঘণ্টা পার হয়ে গেল এ-ও গুনলে চলবে না, আমার কথা তোমাকে শুনে যেতে হবে এই ঘাসের ওপরে বসে, গাছের তলায়। এসো বসি।

বসলো দুজনে। তারপর অশোকা বললে—সাপ!

—সাপ! কীসের?

হাসল অশোকা, বললে—অভিশাপের কথা বলিনি, বলেছি নিছক বাস্তব একটা কথা। সাপখোপ থাকতে পারে ত? এই দেখ মনের ভুলে রাত্রিবেলা নাম করে ফেললাম! লতা। লতার কামড় গ্রাহ্য করলেও চলবে না, কী বলো?

—না না, সেসব ভয় নেই।

—ভরসাও নেই। নাও, বলো।

দিব্যেন্দু বললে—আমার একটা অতীত আছে অশোকা। খুব সংক্ষেপেই বলব। কলকাতার উপকণ্ঠে একটা অঞ্চলে আমরা কিছুদিন বাসা ভাড়া করে ছিলাম। এই কাজে যোগদান করার কিছু আগের ঘটনা। তোমার মতো সুন্দরী সে নয়, তোমার মতো শিক্ষিতাও সে নয়, তোমার মতো অনুভূতিশীলও সে নয়, অতি সাধারণ—তুচ্ছ একটা মেয়ে, আমার বাবার মতোই স্বল্পবিত্ত এক শিক্ষকের মেয়ে। এর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উঠেছিল যখন আমি মার্চেন্ট অফিসে সামান্য মাইনের কেরানীর চাকরী করি।

স্তব্ধ হয়ে সবই শুনে যাচ্ছিল অশোকা, কোন কথা নেই তার মুখে। দিব্যেন্দু বললে—প্রতিমা তার নাম। প্রতিমা ঘোষ। তোমরাও যেমন স্বজাত, ওরাও তাই। কোন দিকেই কোন বাধা নেই, বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে নিজে। চাকরী নিয়ে যখন চলে আসি, তখন সবার আড়ালে কাছে এসে হঠাৎ প্রণাম করেছিল, বলেছিল—যাও ; আর দেখা হবে না।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম—কেন ?

ছলছল চোখে সে বলেছিল—তোমাকে আমি হারিয়ে ফেললাম।

—কেন ?

বলেছিল—তুমি বড় হবে, অনেক টাকা হবে তোমার, কিন্তু আমার ভালবাসার মানুষ, সেই শিল্পীটিকে যে হারিয়ে ফেললাম, সে বিষয়ে ভুল নেই।

অবশ্য যে ভাষায় আমি তোমাকে গুছিয়ে বলছি, ঠিক এতখানি গুছিয়ে সে বলতে পারেনি, তবে তার বক্তব্য ছিল এই। তুমি ত শুনেছ অশোকা, আমি ছবি আঁকতাম। পরিপূর্ণ খেয়ালী একটি মানুষ ছিলাম, দারিদ্র্য ছিল আমার ভূষণ। খাওয়া-দাওয়া বিলাস-ব্যসনের দিকে ঝোঁক নেই, ঝোঁক ছবি আঁকায়। আর্টস্কুলে পড়তে পারতাম, কমার্শিয়াল আর্ট শিখলে দুপয়সা রোজগার হয়ত হতো, কিন্তু অভিভাবকদের দৃঢ় নিষেধের জন্যই সেটা হয়নি।

হয়নি বলে দুঃখ নেই, কিন্তু মনটা কাঁদে। কোনো কিছু সুন্দর দৃশ্য দেখি, কারুর কোনো সুন্দর ভঙ্গিমা দেখি, ভিতরে অমনি এক আকুলতা অনুভব করি, ভাবি, যে আদি কবি সেই আদিকাল থেকে এই সব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে চলেছেন, তাঁকে না চিনতে পারি, তাঁর সৃষ্ট সৌন্দর্যকে একটুখানি ধরে রাখি রঙে ও রেখায়। জলবিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর ছায়াকে ধরবার প্রয়াস আর কী! আমার টেকনিক জানা নেই, শিক্ষা নেই। কিন্তু অদ্ভুত একটা আকুলতা অনুভব করি। সেই আকুলতা যখন জাগে, তখন অস্থির হয়ে ওঠে সমস্ত শরীর মন। আজকাল অবশ্য সেইসব ভাব অনেক কমে এসেছে, তবু মরেও এখনো মরে নি। মাঝে মাঝে অন্তরের হাহাকার আজও শুনতে পাই!

বলতে বলতে এইখানে এসে চুপ করে গেল দিব্যেন্দু। কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবে। অশোকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো, বললে—রাত হয়ে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে দিব্যেন্দুও উঠেছে, বললে—হ্যাঁ, এবার ফিরতে হয়। কিন্তু এত কথা বলা সত্ত্বেও মনে হচ্ছে, সব কথা বলা হয় নি।

বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল অশোকার মুখে, বললে—বোলো, আমি ত পালাচ্ছি না।

যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো দিব্যেন্দু, বললে—আবার কবে দেখা হবে?

—কাল। কাল যাবো তোমাদের বাড়ি।

—ঠিক ত?

—ঠিক।

ওকে ওর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে দিব্যেন্দু যখন নিজের বাড়ির দিকে ফিরে আসছে, তখন মনে হলো, মনের একটা ভার ছিল, সেটা যেন অনেক হাল্‌কা হয়ে গেল।

পরনে সাধারণ একটা সাদা শাড়ি, অশোকা পরদিনই এলো

ওদের বাড়ি। সুনন্দা দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে গেল ওকে অভ্যর্থনা করতে। কলরব করতে করতে ওরা এসে দাঁড়ালো দিব্যেন্দুর ঘরের মধ্যে। সকালবেলা। দিব্যেন্দু ততক্ষণ স্নান করে জলখাবার সেরে নিয়েছে। পোশাক পরিবর্তনটুকুও করা হয়েছে। অশোকা সেটা লক্ষ্য করলো, বলল,—একী! বেরুচ্ছেন নাকি?

দিব্যেন্দু বললে—হ্যাঁ, অফিসের কাজে একটু বেরুচ্ছি। তুমি—

বলেই, একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলে উঠল—আপনি বসুন না?

'তুমি' বলে ওর ঐ যে থতমত খাওয়া, সেটা দেখে মুখ টিপে একটু হেসে ফেলেছে সুনন্দা। অশোকাও মুখ টিপে একটু হাসল, বললে—তুমি করেই বলুন না?

দিব্যেন্দু একটু গম্ভীর হয়েই বললে—আপত্তি কি? বয়সে বোধ হয় বড়োই হবো।

বোধ হয়! এবার অশোকা স্পষ্টতই হেসে ফেলল। সুনন্দা হাসি সামলাতে ত্বরিৎ পায়ে চলে গেল পাশের ঘরে। ওর প্রস্থান-পথের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে মুখ ফেরালো অশোকা, তারপরে নিম্নকণ্ঠে বললে—একটা কথা আছে।

—বলো?

ও আগ্রহের সঙ্গে বললে—প্রতিমাদের ঠিকানাটা একটু দেবেন?

আশ্চর্য হয়ে দিব্যেন্দু বললে—কেন?

ও আবার একটু হাসল, বললে—দরকার আছে।

এক মুহূর্ত থেমে থেকে দিব্যেন্দু বললে—চিঠি লিখবে বুঝি?

—হুঁ।

—কী দরকার?

নিম্নকণ্ঠে অশোকা বললে—সে তুমি বুঝবে না।

কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ নিজের মনে, তারপরে দিব্যেন্দু বললে—বেশ, লিখে দেবো।

—দাও।

দিব্যেন্দু বললে—অফিসঘরে এসো। কেউ আসেনি এখনো।

বলে, ঘর পেরিয়ে বারান্দায় এসে পাশের ফ্ল্যাট অর্থাৎ যেটা ওদের অফিস, সেখানে এসে দাঁড়ালো দিব্যেন্দু। ওর সঙ্গে সঙ্গে অশোকাও উঠে এসেছে। চারিদিকে তাকিয়ে সে বললে—এই বুঝি অফিস?

—হ্যাঁ, বোসো।

নিজের টেবিলে অশোকার মুখোমুখি বসল দিব্যেন্দু। অশোকা ওর দিকে তাকিয়ে বললে—টাই পরে অফিস মাস্টার হিসাবে বেশ দেখাচ্ছে কিন্তু!

দিব্যেন্দু একটা কাগজ টেনে নিয়ে তাতে লিখলো প্রতিমার নাম, প্রতিমার ঠিকানা। তারপরে সেটা এগিয়ে দিলে অশোকার দিকে, বললে—এই নাও।

নিয়ে উঠে দাঁড়ালো অশোকা, বললে—যাই?

দিব্যেন্দু বললে—বোসো না? এখন সাড়ে আটটা, অফিসের লোকজন আসবে দশটার আগে নয়।

ধীরে ধীরে ও বসে পড়ল চেয়ারে, তারপরে বললে—এই যে বললে, কোথায় যাবে?

দিব্যেন্দু একটু হাসল, বললে—তুমি এসেছ, তোমার অনারে নাই বা গেলাম, দশটার পরেই যাওয়া যাবে।

অশোকা একটু থেমে থেকে বললে· কাজটা কিন্তু ভালো হলো না দিব্যেন্দুদা।

'দিব্যেন্দুদা' শব্দটা হঠাৎ কেমন যেন কানে এসে বাজল, কিন্তু প্রতিবাদ করারও কিছু নেই। বললে—কেন? ভালো হলো না কেন?

অশোকা বললে—মেয়েদের স্বভাবই এই, তারা যদি বুঝতে পারে, তাদের শ্রদ্ধেয় কারুর কোনো ক্ষতি হচ্ছে, তাহলে জ্ঞানতঃ তারা সেই ক্ষতির কারণ হতে চায় না।

দিব্যেন্দু তাড়াতাড়ি বলে উঠল—না না, ক্ষতি কেন হবে, কিছু ক্ষতি নেই।

অশোকা মুখ টিপে আবার হাসল, বললে—বাবা কি বলছিলেন জানো ?

—কি ?

—বলছিলেন, দিব্যেন্দু 'স্টোয়িক্' টাইপের ছেলে। দেখবে, ভোগের থেকে ত্যাগের দিকেই ওর ঝোঁক হবে।

দিব্যেন্দু 'স্টোয়িক্' কথাটার অর্থ জানে, জানে বলেই কেমন যেন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ল, বললে—না না, উনি জানেন না। আমি—

—থাক—বাধা দিয়ে শান্ত কণ্ঠে অশোকা বললে—আত্ম-সমালোচনা এখন না-ই বা করলে।

দিব্যেন্দু তবু বলতে লাগল—আসল কথা, আমি খুশি নই। এক অপ্রসন্ন মন নিয়ে দিবারাত্র অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মনটা বারবার বলে 'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'। বিশ্বাস করো, মনটা ছবি আঁকতে চায় অনুক্ষণ।

—আঁকো না কেন ?

—অতো সোজা ?—দিব্যেন্দু বললে—সৃষ্টি কিছু করতে চাই, কিন্তু তার জন্য মনের যে প্রস্তুতির দরকার, সেটা করতে পারছি কই ? সেটাই যে আসল।

অশোকা মুখ তুলে ওর দিকে তাকালো পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে, উজ্জ্বল হয়ে উঠল দুটি চোখ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুখখানাও অদ্ভুত বিবর্ণতায় ভরে গেল। বলল—প্রতিমা এলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

যেন বিদ্যুতের স্পর্শে প্রচণ্ড চমকে কেঁপে উঠল দিব্যেন্দু, বললে—কী বলছ তুমি !

বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে, বললে—মন্দ কিছু বলছি কী ?

হঠাৎ বেরিয়ে গেল দিব্যেন্দুর মুখ দিয়ে—তোমাকে যে হারাতে হবে তাহলে !

মুখখানা নত করলে অশোকা, একটুক্ষণ সেইভাবে চেয়ে আবার

মুখ তুললো, বললে—একটা কিছু পেতে হলে একটা কিছু যে হারাতেও হয়, জানো না ?

স্থানুর মতো চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে রইল দিব্যেন্দু। অশোকা সেই দৃষ্টির সম্মুখ থেকে চোখ নামিয়ে মুখখানি নত করে রইল কয়েক মুহূর্ত। দিব্যেন্দুর একবার মনে হলো, কীসের আবেগে যেন কাঁপছে ওর ঠোঁটছুটি। এটা অবশ্য দিব্যেন্দুর দেখবার ভুলও হতে পারে।

হঠাৎ-ই একসময় মুখ তুলল অশোকা, বললে—যাই, কেমন ?

এবং দিব্যেন্দু উঠে বাধা দেবার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল অশোকা। আর সেই যে গেল, এলো একেবারে সাতদিন পরে।

ছুটিরই দিন হবে সেটা—দিব্যেন্দু তবু বেরিয়েছিল, ফিরে যখন এলো, তখন বিকেল বেলা। এসে ঘরে ঢুকে দেখে, তার বোনের সঙ্গে খুব হেসে হেসে গল্প করছে অশোকা।

ওকে দেখে গল্প থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় গেছলেন ? সেই থেকে বসে আছি ?

দিব্যেন্দু ঘরের চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে—মা কোথায় ?

উত্তর দিতে যাচ্ছিল দিব্যেন্দুর বোন, কিন্তু তার আগেই ঈষৎ কৌতুকের হাসিতে মুখর হয়ে উঠল অশোকা, বললে—কী মাতৃভক্ত ছেলে বাবা, এসেই মায়ের খোঁজ।

বোন বললে—আমরা ত অশোকাদিদের বাড়িতেই গিয়েছিলাম। অশোকাদিই আমাকে টেনে আনলো এখানে, বললে—এই চল না, তোর দাদা এসেছে বোধ হয় এতক্ষণে, একটু গল্প করে আসি।

ততক্ষণে আসন গ্রহণ করেছে দিব্যেন্দু, বললে—মা কোথায় তা ত এখনো বললি না।

বোন বললে—অশোকাদিদের বাড়িতেই রয়ে গেছে, গল্প করছে।

দিব্যেন্দু একটু হাসল। এবার বোনকে উদ্দেশ করে বললে—

দেখলি ত, এসেই মার খোঁজ করলাম কেন? তদ্বির করে রান্নাঘর থেকে এখন চা এনে দেবে কে?

একটু অপ্রস্তুত বোধ করে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালো সুনন্দা, বললে—আমিই যাচ্ছি।

অশোকা বললে—আমিও যাই না?

সুনন্দা ফিরে দাঁড়ালো, বললে—না ভাই, তুমি থাকো। তুমি অতিথি। আর তাছাড়া, দাদার সঙ্গে গল্প করবে বলে এলে না তুমি?

বলেই, ও আর দাঁড়ালো না, চলে গেল রান্নাঘরের দিকে দ্রুত পায়ে।

দিব্যেন্দু বললে—এই সাতদিন গল্প করার ইচ্ছে হয়নি বুঝি?

মুখ টিপে হাসতে লাগল অশোকা, বললে—দিনক্ষণ গোনা হয়েছে বুঝি? সাতদিন? কে জানে, হবেও বা।

—কী করলে এই সাতদিন?

তখনো তেমনি করে দুষ্টুমির হাসি হাসছে অশোকা, বললে—এই সাতদিন? ভেবেছিলাম, কেউ আসে কিনা গল্প করতে। তা কেউ এলো না।

—আর কেউ আসতে পারত বুঝি?

—ওমা, পারত না। এত লোক রয়েছে, একটু প্রশ্রয় পেলেই হয়।

—তাই নাকি?

অশোকা বললে—মিস্টার গুপ্তেকে চেনো? এখানকার ব্যাঙ্কের ম্যানেজার?

দিব্যেন্দু বললে—খুব চিনি! কনট্রাকটরের ব্যবসাতে কাজ করি, ব্যাঙ্কের কর্তাটিকে চিনব না? ওতো মারাঠী।

অশোকা বললে—শান্তিনিকেতন ফেরৎ-মানুষ, চমৎকার বাঙলা বলে।

—তা-ও জানি,—দিব্যেন্দু বললে—ব্যাপারটা কী? মানুষটিতো আমাদের চেয়েও বয়সে বড়ো। বিয়ে থা করেনি?

অশোকা তখনো হাসছে, বললে—না। বাঙালী মেয়ে বিয়ে করার শখ।

দিব্যেন্দুও হেসে উঠল, বললে—আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নাকি, সত্যি ?

হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল অশোকা, বললে—না। গুপ্তে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে কথাটার তাৎপর্য বোধ করবার চেষ্টা করছে দিব্যেন্দু, অশোকা করল কী, চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ওর দিকে একটু ঝুঁকে বসল, তারপরে নিম্নকণ্ঠে বললে – প্রতিমা আমাকে চিঠি লিখেছে।

প্রচণ্ড চমকে একেবারে কেঁপে উঠল দিব্যেন্দু,—কই ?

অশোকা হাত বাড়িয়ে একটা 'ইনল্যাণ্ড কভার' ওর দিকে এগিয়ে দিলো।

সেটা তাড়াতাড়ি নিয়েই চোখের সামনে মেলে ধরল দিব্যেন্দু। সেই পরিচিত কাঁচা হাতের অক্ষরগুলি। একটা গানের খাতায় গানের পর গান টুকে রাখত। বড়ো সখ ছিল গান শিখবার। কিন্তু, বিত্তহীন ঘর, পয়সা দিয়ে মাস্টার রেখে কে ওর গান শেখবার ব্যবস্থা ক'রে দেবে ? শুনে শুনে যেটুকু পারত, শিখে রাখত। মাঝে মাঝে দেখাতো ওকে সেইসব গান। বলতো 'এইটি শিখেছি'। কিন্তু, গাইতে বললে লজ্জা পেতো, কখনো গাইত না তার সামনে। কতো গানই না লেখা ছিল ওর খাতায়। 'হার মানালে গো, ভাঙিলে অভিমান,'—'বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আসবে যদি শূন্য হাতে,'—'আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে।'—এইসব গানের লাইনের কথা এখনো মনে পড়ে দিব্যেন্দুর। গানের এইসব লাইনের নীচে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে রাখত সে—কেন, কে জানে।

সেই পরিচিত হস্তাক্ষরেই অশোকার চিঠির উত্তর দিয়েছে প্রতিমা। লিখেছে—'অশোকা দেবী, আমাকে কেউ কখনো চিঠি লেখে না। কেউ কোথাও লেখবারও নেই। তাই আমার নামে চিঠি

এসেছে বলে রব যখন উঠল বাড়িতে, তখন অবাক হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি খুলে দেখি, পরিচিত হস্তাক্ষরও নয়। তখন আরও অবাক হয়ে গেলাম। চিঠি নিয়ে চলে এলাম একেবারে নিরালায়, রান্নাঘরে। কী সুন্দর হস্তাক্ষর, কী সুন্দর ভাষা আপনার। আমারটা আপনার কাছে লজ্জা পাবে। কিন্তু এমন কথা সব লিখেছেন, তাতে, উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত আমার লজ্জাও যে ঘুচবে না। সুনন্দা আর তার দাদার কাছ থেকে যে আমার কথা জানতে পেরেছেন তাতে আরও আশ্চর্য হচ্ছি। কেউ যে কাউকে আমার কথা বলতে পারে, তা আমার ধারণাই ছিল না। আপনি লিখেছেন, ওরা আমাকে আজও সমান ভালবাসে। হয়ত বাসে, গরীব ও রূপহীনা মেয়েকে অনেক সময় করুণার চোখেও দেখে থাকে কেউ কেউ, আমার কাছে সেই করুণাই যথেষ্ট। আপনি যাকে ভালবাসা লিখেছেন, সেটা কিন্তু করুণাই। ভুল বুঝবেন না, এই করুণাও আমার কাছে তাচ্ছিল্য করবার নয়। কারণ, বিশ্বসংসারে কেউ-না-কেউ তাহলে রেখেছে আমাকে মনে। এটা জেনেই পরম তৃপ্তি লাভ করেছি, আর আমি কিছু চাই না।'

তারপরে কিছু মামুলি কথা লেখার পর 'ইতি'র নির্দেশ টানা রয়েছে চিঠিতে।

চিঠিটা ভাঁজ করে ওর হাতে ফিরিয়ে দিতেই ও সেটা ওর হাত-ব্যাগে পুরে ফেলল।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো দিব্যেন্দু, পাশের ঘরে গিয়ে বাইরের পোশাক ছেড়ে মামুলী পোশাক পরে এলো। ততক্ষণে চা-ও এসে গেছে। অশোকার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী যেন সব বলছে সুনন্দা। ওকে দেখামাত্রই কথা থামালো, সে বললে—এই নাও চা।

—তোর ?

—আমি তখন খেয়েছি, আর খাবো না।

বলেই বাইরের দরজার দিকে যেতে যেতে একবার ঘুরে দাঁড়ালো

সুনন্দা, বললে—তাহলে অশোকাদি, আমি—

মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকালো দিব্যেন্দু, বললে—যাচ্ছিস কোথায় ?

—মার কাছে, তোমরা গল্প করো।

বলে আর দাঁড়ালো না, চলে গেল তাড়াতাড়ি।

অশোকা মৃদুকণ্ঠে বললে—আমিও ঐসঙ্গে গেলে পারতাম।

দিব্যেন্দু চায়ে চুমুক দিয়ে বললে—একটু থাকো।

অশোকা মুখ নামিয়ে মন দিলো চায়ে।

দিব্যেন্দু একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর বললে—ওদের ঠিকানা তোমাকে জানানো উচিত হয়নি।

—কেন !

—চিঠি লিখতে পারতে না।

অশোকা বললে—লেখবার ফলে কিছু ক্ষতি হয়েছে কী ?

দিব্যেন্দু বললে—একটা মেয়ে একটা-কিছু ভুলে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছিল, তাকে এমনভাবে নাড়া না দিলেই ভালো হতো !

অশোকা বললে—কিন্তু সে সব ভুলে যাক, এইটাই কি চেয়েছিলে ?

দিব্যেন্দু আর্তকণ্ঠে বলে উঠলো—হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা-ই আমি চেয়েছিলাম !

অশোকা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপরে একসময় নিজেই সে নীরবতা ভঙ্গ ক'রে বলে উঠল—কেন যে এই ব্যাপার হলো, তা আমি আজও ঠিক বুঝতে পারলাম না !

দিব্যেন্দু বলে উঠল—বুঝানো আমার পক্ষেও কঠিন। কেন যে আমার মন অনুক্ষণ অস্থির হয়ে থাকে, কেন যে মন চায় ছবি আঁকা নিয়ে থাকতে, কিছু একটা করে যেতে, তা-ও ঠিক বুঝতে পারি না !

অশোকা বললে—অবসর সময়ে ছবি ত এখনো আঁকতে পারো।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে দিব্যেন্দু বলে উঠল—খুব কঠিন কাজ। আঁকতে

যাই আবার সব টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ে ফেলি। তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে অশোকা, এ আমার আত্মার আকুতি। আমি ত আঁকার ব্যাপারে কোনো শিক্ষালাভ করিনি। করবার অবসরও তেমন পাইনি। কেরানী, কেবল কেরানীগিরি করে চলেছি। অথচ কেন যে মন এতে মানিয়ে চলতে চায় না, তা-ও বুঝতে পারিনা নিজেই।

অশোকা এবার মৃদুকণ্ঠে বললে—একটা কথা বলব? বিয়ের সঙ্গে এর কি সম্বন্ধ?

দিব্যেন্দু বললে—প্রতিমা যে আমার শিল্পী জীবনকেই ভালবেসেছিল, সেইজন্যই ভয় হয়—

অশোকা একটু হেসে বললে—ও! এই। ও সে ঠিক মানিয়ে নিতে পারবে। মেয়েরা না পারে কী?

দিব্যেন্দু ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তারপরে বললে—না, তা হয় না।

—কেন?

দিব্যেন্দু বললে—তোমার প্রতিও একটা কর্তব্য রয়েছে।

খিলখিল করে এবারে হেসে উঠল অশোকা, বললে—তাই নাকি? কী কর্তব্য?

দিব্যেন্দু বললে—বুঝে নাও।

অশোকা তেমনি লঘুকণ্ঠে বললে—আমাকে বিয়ে করতে সাধ, সত্যিই?

দিব্যেন্দু উঠে দাঁড়ালো, বললে—হ্যাঁ।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল অশোকাও, বললে—তাহলে বাবাকে গিয়ে বলি?

—কী বলবে?

অশোকা মিছিমিছি হাসতে আরম্ভ করল, বললে—বলব দিব্যেন্দু বাবু তোমার ফার্মের পার্টনার হতে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়েছেন।

দিব্যেন্দু বললে—ক্ষতি কী? তাতে ত লাভই।

—লাভ ত বটেই!—অশোকা বললে—এতদিনে মতি হয়েছে দেখছি। আমি ত আগেই বলেছিলাম—সবাই যা চাইছে তাই করো।

দিব্যেন্দু স্তব্ধ হয়ে কী ভাবছে দেখে অশোকা আবার বললে—কিন্তু তোমার ছবি আঁকার কী হবে?

—হবে না।

—কেন হবে না? আমাকে বিয়ে করলে হবে না কেন?

দিব্যেন্দু বললে—সেটা বিয়ের পরেই ভাবা যাবে। ছবি আঁকা হয় হবে, না হয় না হবে।

মুখ টিপে হেসে অশোকা বললে—না হয় না হবে? মন কাঁদবে না অনুক্ষণ ছবি-আঁকার জন্যে?

দিব্যেন্দু এবার একটু হাসল, বললে—সে কান্নার ক্ষতিপূরণ হবে—তুমি।

—ওঃ, খুব যে!—অশোকা দুষ্টুমীর সুরে বললে—এত আদর বিয়ের পরে থাকলে বাঁচি।

—নিশ্চয়ই থাকবে, তুমি দেখো?

অশোকা চোখ ঘুরিয়ে বললে—'বিবাহের পঞ্চম বরষে?' তখন হয়ত মনে হবে, কী করলাম! এর থেকে প্রতিমা জীবনে এলে অনেক ভালো হতো! কী, মনে পড়বে না ওর কথা?

দিব্যেন্দু একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপরে মনের ভিতরকার একটা ব্যথার ছোঁয়াকে যেন জোর করে ঠেলে ফেলে দিলো, বললে—তা পড়লেই বা!

হেসে ফেলল অশোকা, বললে—সইবো কেন? সতীন কাঁটা কে সয়?

—সতীন!

অশোকা বললে—যদি, বিয়ে হয় অবশ্য। আর নইলে, ওর সঙ্গে বিয়ে হলে, ও-ই ভাববে আমাকে সতীন।

বলে আর দাঁড়ালো না, হাসির একটা লহর তুলে চলে গেল নিজের বাড়ির দিকে।

এরপরে কয়েকটা দিন আর দেখা হয়নি অশোকার সঙ্গে দিব্যেন্দুর। পরদিন রাত্রে হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এলো কলকাতা থেকে। তা থেকে জানা গেল, তার দূর সম্পর্কের ভাই, তার ফার্মের মালিক শ্রীপতিবাবু আসছেন ব্রাঞ্চ-অফিস পরিদর্শন করতে।

এলেন তিনি সত্যিসত্যিই তুদিন পরে। প্রায় সাতফুট লম্বা রোগা মানুষ, মাথার সামনেটা চুল উঠে গিয়ে কপালটা ভয়ানক চওড়া দেখায়। চোখে রোল্ড গোল্ডের চশমা, হাতে গোল্ড ফ্লেক্ সিগারেটের টিন। পরনে ট্রাউজার আর হালফ্যাসানের হাওয়াইয়ান সার্ট। রঙটা কালোই, তবে নিয়মিত মাজাঘষার দরুন একটু চকচকে দেখায় গায়ের বর্ণ। স্টেশনে তাকে দেখেই বললে—একটা টেণ্ডার দেবার আছে। তোমাকে সব বলছি চলো।

এখানে গোটা কয় মটোর আছে মাত্র ভাড়া খাটার মতো। তারই একটা ঠিক করে রেখেছিল দিব্যেন্দু। তাতে করে বাড়ির দিকে আসতে আসতে শ্রীপতিবাবু বললেন—কাকীমা কেমন আছেন?

—ভালো।

—সুনন্দা?

—ভালো।

—তোমার শরীর ভালো?

—ভালো।

গাড়িটা তখন একটা বাঁক নিচ্ছে, শ্রীপতিবাবু বললেন—পঞ্চানন মিত্রের খবর কী? ওর মেয়ে নাকি এখানে?

—হ্যাঁ।

—কী যেন নাম?

—অশোকা।
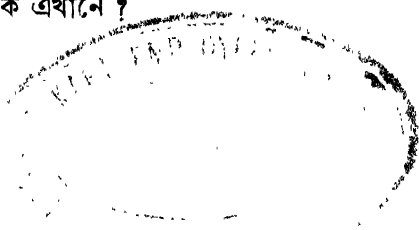
শ্রীপতিবাবু একটু থেমে থেকে তারপর বললেন—চৌধুরী আসেনি কেন হে ? আমি এলে ও তো প্রত্যেকবার স্টেশনে আসে !

চৌধুরী ওদের সেই কেরানী বাবুটি। দিব্যেন্দু তার কথায় একটু চম্‌কে উঠে তারপরে বললে—না, তুমি যে আসবে, তা সে জানে না।

শ্রীপতিবাবু দিব্যেন্দুর থেকে দু'চার বছরের বড়ো হলেও তুমি-তুমি করে সম্বোধন করারই সম্পর্ক ছিল ছোটবেলা থেকে। ওর কথা শুনে তিনি সংক্ষেপে শুধু বললেন—ও।

এলে, দিব্যেন্দুর সঙ্গেই থাকেন তিনি। এবারও তাই রইলেন, তার মা ও বোনের সঙ্গে যেমন কথাবার্তা বলেন, তেমনি বলতে লাগলেন। সবদিকেই সব কিছু স্বাভাবিক, কিন্তু তারই মধ্যে দিব্যেন্দুর শুধু মনে হতে লাগলো কোথায় কী যেন একটা ছন্দ-পতন হয়ে গেছে।

সারাদিন এবং রাত্রিটা ত কাটল টেণ্ডারের কথাবার্তা নিয়ে। কী ভাবে কী দেওয়া যায়, এইসব বৈষয়িক আলোচনাও চলল। চৌধুরী যথারীতি ভঙ্গীতে মনিবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গেল। এখানেও কিছু যে ঘটেছে বলে সহসা মনে হলো না। মনে হলো, অর্থাৎ সব জানা গেল তার পরদিন, মধ্যাহ্নে, যথানিয়মে অফিস বসবার পরে। শ্রীপতিবাবু হঠাৎ বললেন—চৌধুরী তোমার চিঠি।

এবং, চিঠির উল্লেখে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল চৌধুরী, কেমন যেন ভয়ার্ত চাউনি ফুটে উঠল ওর দুটি চোখে। আর সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারল দিব্যেন্দু, চৌধুরী নিশ্চয়ই এমন কিছু লিখেছেন কলকাতায়, যার ফলে অতি হঠাৎ-ই শ্রীপতিবাবুর এই আবির্ভাব। এটা বুঝেই, মনে মনে প্রস্তুত হতে লাগল দিব্যেন্দু।

শ্রীপতিবাবু কিছুক্ষণ পরেই চৌধুরীকে একটা কাজে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দিয়ে তার দিকে ফিরে তাকালেন, বসলেন চেয়ারটা টেনে মুখোমুখি। হাতের সিগারেটে একটা টান দিয়ে বললেন—দিব্যেন্দু, তুমি নাকি পঞ্চানন মিত্রের ফার্মের পার্টনার হচ্ছো ?

খুব বেশী চম্‌কে না উঠলেও একটু অপ্রস্তুত যে দিব্যেন্দু বোধ না করলে এমন নয়। সে ভাবটা একটু সামলে নিলে।

বললে—এইসব রটনা বুঝি ?

শ্রীপতিবাবু বললেন—রটনা ত অনেক কিছু। পঞ্চানন মিত্রের মেয়েকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে যাও, হেন-তেন অনেক কিছু। তা, মেয়েটি কেমন হে ?

—ভালো।

—বিয়ে করার মতন ?

দিব্যেন্দু একটু হেসে বললে—তা বিয়ে করার মতন বইকী। সুন্দরী।

—বটে! শ্রীপতিবাবু বললেন—তা কথা কতদূর এগিয়েছে ?

—অনেকদূর।

—আচ্ছা। তাহলে ত পঞ্চানন মিত্রের সঙ্গে দেখা করতে হয় একবার।

—কেন ?

শ্রীপতিবাবু বললেন—কী বলো, বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটতে যাচ্ছে, দেখা করব না ?

তার পরেই একটু থেমে, একটু হেসে বললেন—বিয়ে করো, কিন্তু পার্টনার হতে যেও না, ঠক্‌বে।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন শ্রীপতি বাবু। যেমন সভাভঙ্গের ঘোষণা করে আসন থেকে উঠে দাঁড়ান সভাপতি, তেমনি আর কী! বললেন—আজই দেখা করছি মিত্রের সঙ্গে। তুমিও যাবে। এর একটা নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়াই ভালো।

'নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া কি অতই সহজ'—মুখ ফুটে একথা না বলে মনে মনে বললেও, নিষ্পত্তি একটা সত্যিই হয়ে গেল অদ্ভুত রূপে। সন্ধ্যের পর যখন ওরা দুজনে মিত্রের বাংলো বাড়ির ভিতরে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন, প্রথম থেকেই কেমন যেন নিঝুম লাগছিল

বাড়িটা। সামনের বারান্দার অন্ধকারে চুপচাপ একা বসেছিলেন পঞ্চাননবাবু। কাছেই একটা রাস্তার কুকুর বিশ্রী ভাবে একটা সুর তুলে যাচ্ছে, সেটা কানে আসছে, আর কী রকম যেন অসাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল দিব্যেন্দু।

পঞ্চানন বাবু নিরুত্তাপ কণ্ঠেই ওদের স্বাগত করলেন, তারপর একসময় হঠাৎ উঠে, দিব্যেন্দুকে ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে। আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে বললেন—বোসো।

বসল দিব্যেন্দু।

পঞ্চাননবাবু টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা খাম-খোলা চিঠি ওর হাতে তুলে দিয়ে বললেন—পড়ো। ওটা তোমাকেই দিয়ে গেছে সে। দেখ, খামের ওপর তোমাব নাম লেখা।

তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলে পড়তে শুরু করল দিব্যেন্দু।—"হঠাৎ কলকাতায় যেতে হলো। একাই গেলাম। গুপ্তে আসবে দুদিন পরে। বাবার সঙ্গে কথাকাটাকাটি না হলে তার সঙ্গেই আসতাম। নিশ্চয়ই আমার ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছ, আমি গুপ্তেকেই বিয়ে করব ঠিক করেছি। এবং এ-ও বুঝতে পেরেছি তুমি এতে ভিতরে ভিতরে মুক্তিই পেলে। আমি মেয়ে হয়ে মেয়েমানুষের দুঃখটা বুঝবার চেষ্টা করেছি। প্রতিমার চিঠিটা মনে পড়ে? ওর ঐ অমন ভালবাসাকে অগ্রাহ্য করি, এমন শক্তি আমার নেই। আমি নিজে ভালবাসাকে মূল্য দিই, ভালবাসাকে শ্রদ্ধা করতে চাই। তোমার সঙ্গে আমার যেটা হতে যাচ্ছিল, সেটা হচ্ছে চুক্তি। বিয়ে করে আমরা পরস্পরকে ভালবাসব, তার প্রতিশ্রুতি। তা আজকের দিনে, যখন সব কিছু ধ্যানধারণা আজ বিবর্তনের পথে, তখন ও প্রতিশ্রুতির মূল্য কতটুকু বলতে পারো? আমি কলকাতা পৌঁছেই দেখা করব প্রতিমার সঙ্গে। তারপরে, আর কী? তোমার সবই বজায় রইল। সুখী হও, এ প্রার্থনা ছাড়া আর কী করতে পারি? এ ব্যাপারে আমার বাবা যেমন ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, তোমার মা-ও তেমনি

ক্ষুণ্ণ হবেন মনে হয়। কারণ, তাঁর বড়ো ইচ্ছা ছিল আমাকে ঘরে নেবার। কিন্তু এইসব ক্ষুণ্ণতা আর নিরাশার বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধে নেমেছি, তুমি তেমনি পারবে না ? গুপ্তে বাবার কোনো সম্পত্তি চায় না, আমিও চাই না, সে কথা বাবাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়ে এসেছি।"

চুপ করে রইল দিব্যেন্দু। হাত থেকে চিঠিটা আপনিই কখন শিথিল হয়ে পড়ে গেছে খেয়াল নেই। এক সময় চমক ভেঙে লক্ষ্য করল, মিত্রমশাই মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছেন চিঠিটা।

কুড়িয়ে নিয়ে, খামে পুরে, উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—চলো, বাইরে যাই। শ্রীপতিবাবু একা বসে আছেন। যন্ত্র-চালিতের মতই আবার এলাম বারান্দায় ওঁর পিছনে-পিছনে। উনি আলো নিয়ে এলেন এবার হাতে করে। চাকর বাকরকে ডেকে যে লণ্ঠন আনতে বলবেন, এমন মনের অবস্থাও বোধ করি নয়। আলোটা টিপয়ের ওপর রেখে, কী ভেবে, চিঠিটা এগিয়ে দিলেন শ্রীপতিবাবুর দিকে।

শ্রীপতি একটু চমকেই উঠলেন বলা যায়, অবাক হয়ে বললেন—কী ব্যাপার ?

মিত্রমশাই গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—একটা চিঠি। পড়ে দেখুন। আপনার পড়া দরকার।

শ্রীপতি খামটা হাতে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখে নিয়ে বললেন—এতো দিব্যেন্দুর চিঠি।

—তা হোক, আপনি পড়ুন।

অগত্যা চিঠিটা খাম থেকে খুলে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন শ্রীপতি। পড়তে পড়তে আরও গম্ভীর হলো মুখ। তারপরে পড়াটা শেষ করে, চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরে পঞ্চাননবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন সেটা। তিনি বললেন—আমাকে না, ওকে দিন—ওর চিঠি।

চিঠিশুদ্ধ ওর হাতখানা এবার এলো দিব্যেন্দুর দিকে। দিব্যেন্দু ওটা নিয়ে পকেটে রেখে দিলে। শ্রীপতি ততক্ষণে বলে উঠেছেন—এটা আমাকে পড়তে দিলেন কেন, মিস্টার মিত্র ?

মিত্র মশাই বললেন—দিব্যেন্দুকে নিয়ে যে খবরের জন্য আমার কাছে এসেছিলেন, তা ত এক কথায় আপনার জানা হয়ে গেল, নয় কী ?

বলেই উনি একটু হাসলেন, বললেন—আমিও পাকা ব্যবসায়ী শ্রীপতিবাবু, আর বয়সে আপনিও আমার ঢের ছোট। আমি কি বুঝতে পারছি না, চৌধুরীর লেখা গোপন পত্র পেয়ে আপনি হন্তদন্ত হয়ে হঠাৎ ছুটে এসেছেন কেন কলকাতা থেকে এই জঙ্গলের মধ্যে ?

শ্রীপতিকে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতে দেখে মিত্র মশায় আরও একটু হাসলেন, বললেন—ইংরেজের কাছ থেকে ভাল অস্ত্র আমরা শিখে রেখেছি, ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল পলিসি। এর থেকে চট্ ক'রে ভালো ফল পাওয়া গেলেও আখেরে পস্তাতে হয়। যাদের ওপর এটা প্রয়োগ করছি, তাদের ভালবাসা আর আস্থা এতে হারাতে হয়। এবং আজকের দিনে, স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে, ভালবাসা আর আস্থা পরস্পরের মধ্যে গড়ে না উঠলে প্রতিষ্ঠানের পতন অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীপতি এতক্ষণে কথা বললেন। বললেন— মাপ করবেন, এসব কথা আলোচনা করতে আসিনি আপনার কাছে। আমি একটা বিবাহের প্রস্তাব নিয়েই এসেছিলাম। দিব্যেন্দুর সঙ্গে আপনার মেয়ে—

—Too late শ্রীপতিবাবু।—বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন পঞ্চাননবাবু, বললেন—মেয়ে যা decision করেছে, তার ওপর হস্তক্ষেপ করা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—কেন সম্ভব নয়, আপনি তার বাবা হয়েও—

—না,—মিত্র মশাই বলতে লাগলেন—বাবা হয়েও কিছু করতে পারব না। সে সাবালিকা, দ্বিতীয়ত, বাধা দিয়ে লাভই বা কী ? যাক, that is my problem.

শ্রীপতিবাবু উঠে দাঁড়িয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে দিব্যেন্দুও। এর পর যে সব কথাবার্তা হলো, তা নিছক ভদ্রতা-বিনিময়। একটু পরেই ওরা দুজনেই নেমে এলো পথে। হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে পথের

অন্ধকারে আবছা আলোর বৃত্ত সৃষ্টি করতে করতে একসময় বলে উঠলেন শ্রীপতি—প্রতিমা মেয়েটা কে?

—কলকাতায় থাকে।

—আলাপ ছিল বুঝি?

শ্রীপতিবাবু একটু থেমে আবার প্রশ্ন করলেন—কেমন অবস্থা?

—ভালো নয়।

—বাপ-মা আছেন?

—মা নেই, বাপ আছেন।

—কী করেন বাপ?

—স্কুলমাস্টার।

—ও।

কিন্তু প্রসঙ্গের সমাপ্তি এইখানেই ঘটল না। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার পর বসল এক পারিবারিক আসর বলা চলে। শ্রীপতি মাকে কাকীমা-কাকীমা করে এতো আপ্যায়ন করতে লাগলেন যে, দিব্যেন্দুর মা অভিভূত হয়ে পড়লেন রীতিমত। অশোকার প্রসঙ্গও আলোচিত হলো। দিব্যেন্দুর মা সব শুনে শুধু 'ও—হ্যাঁ' 'তাইত' —এসব ছাড়া কিছুই মত প্রকাশ করলেন না।

ক্রমে ক্রমে এলো প্রতিমার প্রসঙ্গ। দিব্যেন্দুর মা ঠোঁট ওল্টালেন, দিব্যেন্দুর বোনও। মা বললেন—সে মেয়ের রঙ কালো। তাছাড়া হা-ঘরের মেয়ে। বাপ দিতে-থুতে পারবে না কিছুই।

শ্রীপতি প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন এইবার, বললেন—ছেলের বিয়ে দিয়ে বেশ কিছু পেতে চাও বুঝি কাকীমা?

—তা ঐ ত আমার বড়ো ছেলে, এত আয় করে, আমিই বা ছাড়ব কেন?

শ্রীপতি দিব্যেন্দুর দিকে আড়চোখে একবার চাইলেন, তারপরে বললেন—কিন্তু যাকে নিয়ে এত কথা, সেই ত কিছু বলছে না, গুম হয়ে রয়েছে!

দিব্যেন্দুর মা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—ও আবার বলবে কী? যা ঠিক করবার, আমরাই করব।

শ্রীপতি খুশি হয়ে বললেন—তাহলে কাকীমা, আমি নিজে একটু সন্ধান-টন্ধান করব? ঠিক তোমার মনের মতই হবে। সুন্দরী, হা-ঘরেরও নয়, বাপ দেবে থোবেও একরকম।

সাগ্রহে দিব্যেন্দুর মা বলে উঠলেন—কেন বাবা? এরকম আছে নাকি?

—আছে। শ্রীপতি বললেন—আমারই এক পরিচিত ভদ্রলোকের মেয়ে। এবার কলকাতা গিয়েই আমি দেখব।

তারপরের কথা খুব প্রাঞ্জল না করেও বলা চলে। শ্রীপতি দু' তিনদিনের মধ্যে চলে গেল। আর সে চলে যাবার ঠিক পরের দিনই এলো খামে ভারী এক চিঠি। ঠিকানা দেখেই বোঝা গেল, হাতের লেখা অশোকার। একগাদা অফিসের চিঠিপত্রের সঙ্গে মিশে এলো এই চিঠি, মা বা বোনের তা জানবার কথা নয়। শুধু, পিওন এসেছে শুনে যেমন মা বা বোন খোঁজ নিয়ে যায়, তেমনি খোঁজ নিয়ে গেল, কলকাতার চিঠি এসেছে কি না, অর্থাৎ, দিব্যেন্দুর বাবা কিম্বা দিব্যেন্দুর ছোট ভাই কোনো চিঠি লিখেছে কি না।

—না, আসে নি।

ওরা চলে যেতেই দিব্যেন্দু খুলল চিঠিটা। খামে হাতের লেখা অশোকার হলেও, আসলে চিঠি লিখেছে—প্রতিমা। লিখছে— "অদ্ভুত কথা সব শুনলাম অশোকাদির মুখে। দিদি বলছি এইজন্য যে, হিসেব করে দেখলাম ও আমার থেকে এক বছরের বড়ো। এক বছরের বড়োতে এমন কিছু আসে যায় না, তবু ও আমার মুখ থেকে 'দিদি' ডাক শুনে তবে ছাড়ল। শুনলাম, অশোকাদি বিয়ে করছে। অভিভাবকদের বিনা সম্মতিতে—অনেক কাণ্ড করেই নাকি বিয়ে হচ্ছে। তুমি নাকি সবই জানো, অর্থাৎ মিস্টার গুপ্তের সঙ্গে ওর আলাপ-টালাপের খবর সবই নাকি তুমি জানো। তাই

তোমাকে আর নতুন করে কী জানাবো বলো ? তবে, অবাক হলাম ওর দুর্জয় সাহস দেখে ! সত্যি বলছি, আমরা হলে পারতাম না। কিন্তু, তুমি এতক্ষণ কী ভাবছ ? ভাবছ, এইসব কথা জানবার জন্য চিঠি লিখছি বুঝি ? একেবারেই নয়। যে জন্য চিঠি লিখছি, সে অন্য প্রসঙ্গ। হঠাৎ ইনিয়ে বিনিয়ে নিজের কথা বলতে হবে, সেটা ভাবতে গেলেও ধিক্কার দিতে ইচ্ছা করছে নিজেকে। হ্যাঁ গো, অশোকাদির কাছে এ কী শুনলাম ? এখনো মনে রেখেছ আমাকে ? ওখানে তুমি ম্যানেজার মানুষ, কতো সম্মান, কতো অর্থ, কতো প্রতিপত্তি তোমার ! তুমি কি না আমার মতো সামান্য মেয়েকে—। না, কথাটা আমি লিখতে পারছি না। এসব কিছু মনে স্থান দিও না, মা-বাবা যা বলেন, সেইভাবে সুন্দরী কোনো মেয়ে দেখে বিয়ে করো। অশোকাদিকে দেখে আমার খুব ভালো লাগছিল। বেশ মানাতো ওর সঙ্গে। কথাটা ওকে বলেওছিলাম। ও শোনামত্রই আমার মুখ চেপে ধরলে হাত বাড়িয়ে। বললে—দূর মুখপুড়ী !

আচ্ছা, তুমি নাকি বলেছ, তুমি আমাকে—। ছিঃ ! আমি কি তোমার ঐ প্রতিপত্তি আর প্রতিষ্ঠার পাশে দাঁড়াবার যোগ্য ? তাছাড়া আমার মন কি চায়, তা তুমি জানো। আমি গরীবের মেয়ে, গরীবের ঘরই ভালবাসি। তাছাড়া আমার পথও ঠিক করে নিয়েছি। বিয়ে আমি করব না। যা করছি তাই করব। মনে হয় তুমি আমার সম্বন্ধে একটা খবর শুনে সুখী হবে, তাই লিখছি। এক জায়গায় একটা কবিতার প্রতিযোগিতা হয়েছিল, তাতে কী করে যেন, হঠাৎ আমার একটি কবিতা প্রথম পুরস্কার পেয়ে গেছে। কী পুরস্কার দিয়েছে জানো ? একখণ্ড নয়, দুখণ্ড নয়, তিনখণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী। বাবাকে দেখিয়েছি। বাবা কেমন আপনভোলা মানুষ তা ত জানোই। ঐসব দেখেশুনে বাবা একেবারে অবাক ! বললে —তুই আবার কবিতা লিখতে শিখলি কবে রে ?

আমি বললাম—শিখেছি।

মুখে ওকথা বলে সরে এলাম, কিন্তু নিজের মনকে মনে মনে কী বললাম জানো? বললাম, একজন বলত, আমি আর তুমি তুজনেই আঁকব ছবি,—তুমি লেখায়, আমি রেখায়। মনে পড়ে?

অশোকাদি বাবার সঙ্গেও আলাপ করেছে। কী আলাপ—কী প্রলাপ—আমাকে জানতে দেয় না। তবে একটা কিছু যে আন্দাজ করতে পারছি না, এমন নয়। যদি সেরকম কোনো প্রস্তাব যায়-ই সেটা আমার মনোগত অভিপ্রায় বলে ধরো না। মনে করো না, যে, বাবার জবানীতে কাঙ্গালিনীর মতো হাত পাতলুম গিয়ে তোমার দরজায়।"

ঠিক সেই সময়, কাজের চাপও পড়েছিল দিব্যেন্দুর। তবু, এই ফাঁকে প্রায় পাঁচ-ছ'দিন কেটে গেল, বারবার লুকিয়ে সে পড়েছে চিঠিটা, আর মনের মধ্যে তোলপাড় করেছে বারবার।

কলকাতায় থাকেন দিব্যেন্দুর বাবা তার ছোট ভাই নির্ম্মলেন্দুর কাছে। দিব্যেন্দুর বাবার বয়সও হয়েছে, তত্নপরি বাতব্যাধিতে প্রায় পঙ্গু বললেই হয়। নির্ম্মলেন্দু চাকরী করে, সে-ই দেখাশুনা করে বাবার। মা আর বোন থাকে এখানে। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে তাদেরও কেটেছে দিনগুলি। আজ দিব্যেন্দুর কর্ম্মস্থলকে কেন্দ্র করে, দিব্যেন্দুর মায়ের মনে সেদিনের অবদমিত সাধ-আহ্লাদগুলি যদি আজ মূর্ত হয়ে উঠতে চায়, ত, অবাক হবার কিছু নেই। তাই শাড়ি আসে মা-বোনের নানা রকমের, আসে কিছু-কিছু সোনার জিনিসও। দিব্যেন্দু মা-বোনের মন বুঝতে পারে বলেই বাধা দেয় না। তবে, মাঝে মাঝে যখন তাকায়, স্থানীয় কাপড়ের দোকান বা স্বর্ণকারের কাছে বাকী পড়া অ্যাকাউণ্ট্‌গুলির দিকে, তখন মনে মনে শঙ্কিত না হয়ে পারে না। এর ওপর যদি আসে শ্রীপতির সেই পরিচিত ভদ্রলোকের কন্যাটি বধূরূপে, তাহলে, কী যে হবে, ভেবে পায় না দিব্যেন্দু। মাসে-মাসে কাপড়ের দোকান আর

স্বর্ণকারকে নিয়মিত ধার শোধ করার পরও যা পড়ে থাকে, তার পরিমাণও কম নয়, প্রায় হাজার দুই। সত্যি কথা বলতে কী, এমন বিপুল কিছু যে আয় তার, তা নয়, তবে যা ছিল কলকাতায়, তা থেকে যে বেশী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এবং বেশী বলেই, মা-বোনের কল্পনা রঙীন পাখায় ভর করে করে এমন করে ভেসে বেড়াতে চায়।

দিন ছ'-সাত পরেই বোঝা গেল, শ্রীপতিবাবু করিৎকর্মা মানুষ। অফিসিয়াল চিঠির মধ্যে ছোট্ট একটা চিঠি লিখেছেন তিনি দিব্যেন্দুর মাকে। 'কাকীমা, তাঁরা রাজী। মেয়ের ফটো পাঠালাম। পছন্দ হলো কিনা জানাবেন।'

বলা বাহুল্য, ছোট্ট একটা ফটো ছিল মেয়েটির। ছোট্ট কপাল, বড়ো-বড়ো চোখ, পাত্‌লা ঠোঁটের কোণে মৃদু একটু স্বচ্ছ হাসি, মাথায় যে একরাশি চুল, তা বোঝাবার জন্য এলো চুলের একটি গুচ্ছ বুকের পাশ দিয়ে টেনে সামনে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাতের আঙ্গুলগুলি প্রতিমার মত লম্বা-লম্বা নয়, ছোট-ছোট। ছোট্ট দুটি হাতের মুঠি। দোহারা চেহারা। ফটোতে গায়ের রঙ্‌ তেমন বোঝা যায় না, তবু আন্দাজ করা যায়, রঙ ফরসাই। দিব্যেন্দুর মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফটোটা যতো দেখছেন, ততই আনন্দে ভরে উঠছে তার মন। সানন্দে কলরব করে উঠলেন তিনি, বললেন—দেখেছিস ফটো?

—হ্যাঁ।

তিনি আর বোন চলে গেলেন অফিসঘর ছেড়ে, নিজেদের ঘরে। 'অশোকা' বলে যে মেয়ে ছিল, এবং সে-ও যে রীতিমত সুন্দরী ছিল, তাকে তিনি পছন্দও করেছিলেন, সে-সব কথা যেন মুহূর্তে ভুলে গেলেন তার মা।

আর দেরী না করে, অফিসের কাজ কয়েক মুহূর্তের জন্য ঠেলে ফেলে রেখে দিলো দিব্যেন্দু। দিয়ে, টেনে নিলো তার ব্যক্তিগত চিঠির প্যাডটা। লিখলে—"ব্যস্ততার মধ্যে বসে লিখছি তোমাকে।

আমার আর ভাববার সময় নেই। তুমি এসো, এসো আমার জীবনে। তোমার শিল্পী ব্যবসার রথচক্রে পিষে যাচ্ছে ক্রমাগত, কাছে এসে তাকে টেনে তোলাও কি তোমার কর্তব্য নয়? এক কথায়,—এখানে যা চলছে, তাতে—'এ মণিহার আমার নাহি সাজে'।"

এ চিঠির প্রতিক্রিয়া যা ঘটল, তা বলা বাহুল্য, প্রথমেই চিঠির মাধ্যমে। চিঠি এলো প্রতিমার বাবার কাছ থেকে নয়, চিঠি এলো দিব্যেন্দুরই বাবার কাছ থেকে। লিখেছেন তার মাকে।—"সংসারে কোন কথা বলার ভূমিকা নিয়ে আমি আসিনি। তবু একটি কথা আজ আমাকে লিখতে হচ্ছে। প্রতিমার বাবাকে মনে আছে? সত্যকিঙ্করবাবু? তিনি এসেছিলেন। আপনভোলা মানুষটিকে দেখে বড়ো মায়া হলো। তিনি যখন হাত ধরে অনুনয় করে বললেন—আমার মা-মরা মেয়ে প্রতিমাকে আপনি নিন পুত্রবধূ করে, তখন আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমি কথা দিয়েছি। এবার তোমাদের বিচার।"

এটা বোধ হয় কল্পনা করতে পারেনি দিব্যেন্দুর মা। স্বামীর প্রতি অভিমান আর অভিযোগ তাঁর বহুদিন থেকেই, কারণ স্বামী তাঁর স্বচ্ছল অবস্থার মানুষ নয় বলে। আজ সে অভিমান আর অভিযোগ হয়ে উঠল তীব্রতর হয়ে। তিনি হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসলেন বললেই হয়।

দিব্যেন্দু এবারও দেরী করল না। নিজে দিলে বাবাকে উত্তর। —"আপনার আশীর্বাদ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি বাবা। আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা ভঙ্গ করব না। আপনি যথাসত্বর সম্ভব তাদের দিনস্থির করতে বলুন।"

দিনস্থির হয়ে গেল অচিরেই। মা আর বোনের মুখ ভার। শ্রীপতিবাবুর মুখখানাও যেন কল্পনা করা যায়। কোন সমারোহ নয়, কোন উৎসব নয়, দিব্যেন্দু মা-বোনকে রেখে একা গেল কোলকাতায়, ভাই আর বাবার কাছে। যথালগ্নে প্রতিমাকে গ্রহণ

করে বাবাকে প্রণাম জানিয়ে, ছোট ভাইয়ের শুভেচ্ছা নিয়ে উঠে বসল সে তার কর্মস্থলের উদ্দেশে। বিয়ের দিন কয়েক মুহূর্তের জন্য শ্রীপতিবাবু এসেছিলেন। বধূর হাতে একটি হার দিয়ে, দিব্যেন্দুর সঙ্গে দুটো একটা সাধারণ কথা বলে, মুখে একটু মিষ্টি দিয়ে, চলে গেলেন তিনি 'জরুরী কাজ আছে' এই অজুহাত দেখিয়ে। আর সর্বক্ষণ কাছে কাছে ছিলো অশোকা, মাথায় তার সিঁদুর, হাতে শাঁখা। দিব্যেন্দু একসময় বলেছিল—মিস্টার গুপ্তেকে দেখছি না?

হেসে ফেলেছিল অশোকা, বলেছিল—অফিসের কাজে ট্যুরে গেছে, দার্জিলিং।

রাত্রির ট্রেনে একটা প্রথম শ্রেণীতে রিজার্ভ করা কুপেতে যখন নব-বধূকে নিয়ে উঠে বসল দিব্যেন্দু, তখন, অশোকাও উঠে এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে। বলেছিল—আমিও যদি তোমাদের সঙ্গে যাই ত কেমন হয়?

—ভালই হয়।

হেসে বলেছিল অশোকা,—ট্রেন কোম্পানি ঠেলে ফেলে দেবে কামরা থেকে। দেখনি বাইরে কি লেখা? মিস্টার অ্যাণ্ড মিসেস্ ডি-কে-বোস্। ভাগ্যবান পুরুষ, নইলে চট করে এরকম দু বার্থের কুপে—এ পাওয়া যায়?

নির্মলেন্দু ছুটি নিয়ে সঙ্গে যাচ্ছে। সে অবশ্য উঠেছে অন্য কামরায়। আপাতত বাইরে দাঁড়িয়েছিল তার বৌদির বাবার কাছে। কথাটা শুনতে পেয়ে কাছে এলো, বললে—ওটা কিন্তু আমার ব্যবস্থা। কদিন আগে থাকতে রিজার্ভ করেরেখেছিলাম, তা জানেন?

—অস্বীকার করছি না ক্ষমতা। দাদারই ভাই ত।

বলে, হাসতে লাগল অশোকা। তারপর একসময় প্রতিমার দিকে ফিরে বলে উঠল—কীগো, মিসেস্ বোস, চোখে এখনো ধারা বইছে কেন?

বলে, হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল,

বললে—ঐ দেখ, মেশোমশাইয়ের কাণ্ড দেখ। ঐখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছেন? ভিতরে আসুন না, মেয়ে জামাই যে প্রণাম করবে?

ট্রেন যখন সবাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অনেকদূর এসে গেছে, প্রতিমাও চোখের জল মুছে একটু শান্ত হয়ে বসেছে, দিব্যেন্দু তখন কথা শুরু করল, বলল—হিসেব মতো আজ কিন্তু ফুলশয্যা, বাইরে যেতে হলো বলে একদিন পিছিয়ে গেল। তা কী আর করা যাবে? তুমি শুয়ে পড়ো, আমি আপার বার্থে যাই। আলোটাও নিভিয়ে দিচ্ছি, কেমন? শুধু ঐ নীল আলোটা জ্বলুক। দেখেছ, ট্রেন কোম্পানির কী ব্যবস্থা?

ও উঠে পড়া মাত্রই প্রতিমা ওর পাঞ্জাবীর প্রান্ত ধরে টান দিলো, বললো—না।

দিব্যেন্দু ফিরে দাঁড়ালো, বললে—কেন?

প্রতিমা বললে—ভয় করে। শুনেছি, চোর ডাকাত—

দিব্যেন্দু বললে—কিছু ভয় নেই, ভিতর থেকে লক্ করে দিয়েছি, জানালার কাঠ ফেলা আছে, ভয়টা কিসের?

—তা হোক।

অগত্যা, নববধূর পাশেই বসে পড়ল দিব্যেন্দু। বসে, ওর হাতটা হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে ডাকল,—প্রতিমা!

প্রতিমা তাকিয়ে দেখছিল কামরাটা, বললে—আমি কখনো আগে ফার্স্ট ক্লাশে চড়িনি। কামরাটা ফাঁকা-ফাঁকা, কেমন যেন লাগছে।

দিব্যেন্দু হেসে ফেলল, বললে—একটা ত রাত—কাল সকাল আটটার মধ্যেই পৌঁছে যাব।

প্রতিমা এবার ওর দিকে ফিরে বসল, বললে—হ্যাঁ গো, বিয়েতে মায়ের মত ছিল ত, সত্যি বলো?

দিব্যেন্দুর মুখখানা মুহূর্তের জন্য বোধ হয় বিবর্ণ হয়ে গেল। কামরায় মাত্র নীল আলোটা জ্বলছে বলে, স্বল্পালোকে প্রতিমা তা

বুঝতে পারল না। কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে দিব্যেন্দু বললে —কী মুশকিল। একথা কেন? মত ছিলই ত।

প্রতিমা কী বুঝল কে জানে, একটু চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে বললে—জানি না কী ঝড়ের মুখে গিয়ে পড়ব। বড়ো ভয় করছে।

ওকে দুটি হাতে যেন বুকের কাছে টেনে নিয়ে এসে দিব্যেন্দু কোমল কণ্ঠে বললে—আমি আছি, ভয়টা কী তোমার?

প্রতিমা ওর প্রশস্ত বুকের ওপর মাথা রেখে বললে—সংসারে এইত আমার একমাত্র ভরসা! বলে, মাথাটা উঠিয়ে হাত বাড়িয়ে ওর বুকের মাঝখানটাতে আঙুল ছুঁইয়ে রেখে বললে—সত্যি বলতো, এখানে আমাকে স্থান দিয়েছো?

দিব্যেন্দু ওকে একটু আদর করে বলে উঠল—দিয়েছি বইকি। না দিলে এসব ঘটত?

অতি আরামে, অতি নিশ্চিন্তে দুটি চোখ বুজল নববধূ, ওর বুকের ওপর মুখখানা রেখে বলতে লাগল—আর আমার ভয় নেই! যে ঝড়ই আসুক না কেন, সইতে পারব।

কর্মস্থানে পৌঁছে আশা করেছিল দিব্যেন্দু, স্টেশনে কেউ আসবে। কিন্তু আসেনি। বাড়ি যখন পৌঁছলো, তখন কোন মঙ্গল শঙ্খ বাজল না। মা শুধু শুকনো মুখে এসে নিয়মরক্ষা করে গেলেন বধূকে হাত ধরে ঘরে তুলে নিয়ে। বোনও অবশ্য মার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, কিন্তু তারও মুখে প্রসন্নতার আভাস নেই।

এই শুরু। প্রথম প্রথম ওর কি আভাস পাওয়া যায়? প্রবাসী বাঙালী, অতএব বাঙালী যারা সবাই এলেন। কেউ ভাল বললেন, কেউ বললেন না। পঞ্চানন মিত্র এলেন, বধূর মুখ দেখলেন গিনি দিয়ে, দিব্যেন্দু প্রতিমার কানে কানে ওঁর পরিচয়টা দিয়ে দিলে। দু'হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি ওঁকে প্রণাম করল প্রতিমা। উনি বললেন—থাক, থাক।

তারপর মাকে ডেকে কী যেন বলে চলে গেলেন।

কথাটা মা পরে বলেছিল দিব্যেন্দুকে। বলেছিল—মিত্তির মশাই কী বলে গেলেন জানিস? বলে গেলেন, কী বউ এনেছে দিব্যেন্দু? রঙ কালো, রোগা-রোগা চেহারা!

দিব্যেন্দু বললে—মা, তোমারও কি তাই মত?

মা ঠোঁট উল্‌টে বললে—আমার মতামত ত তুমি শুনলে না।

অনেক রাত্রি হয়ে যাওয়ার পর বাড়ি নিস্তব্ধ হলো। বিছানার একধারে একগুচ্ছ ফুল রাখা, এই-ই যাকে বলে ওদের ফুলশয্যা।

প্রতিমা বললে—আমি কি নতুন? সুনন্দা আমার কাছে বেশী আসছে না কেন?

সান্ত্বনা দিয়ে দিব্যেন্দু বললে—আসবে। ভাবছ কেন?

ও দিব্যেন্দুর বুকের কাছে মাথাটা রেখে বললে—আমাকে বিয়ে করে তুমি ভুল করলে না ত? আমি খুব সংসারী নই, কতো কী দোয করে ফেলব, কে জানে। তুমি আমার সব দোষ ক্ষমা ক'রে নিও, কেমন?

—এসব কথা ভাবছ কেন?

ও একটু হাসল দিব্যেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে, বললে—না, আর ভাবব না। যা ভাববার ভেবো তুমি, কেমন?

রাত্রি ভোর হলো। চলতে লাগল দিন। এমনি করে দিন আসে, দিন যায়। অশোকার একখানা চিঠি পেলো প্রতিমা। লিখছে—তোর বিয়ে হলো, আমিও যেন বাঁচলাম, সুখে থাকিস, সুখে রাখিস। সুখে থাকা আর সুখে রাখাই মেয়েমানুষের সব। কী, কথাটা খুব সেকেলে শোনাচ্ছে? শোনালেও, কথাটা যে সত্যি, তা আমি আজ বেশ বুঝতে পারছি। এই ধারণাটা মনে রাখতে না পারলে জীবনে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়। নইলে নিছক নীতি কথা তোকে শোনাতে বসিনি। অবশ্য কথাটা বলা সহজ, মেনে চলা শক্ত।

প্রতিমা দিব্যেন্দুকে দেখালো চিঠিটা, বললে—দেখছ, কী লিখেছে?

—দেখেছি।

প্রতিমা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তখনো মিষ্টি মিষ্টি হাসছে, বললে—এসব কথা ত জানতুম না! অশোকাদিও এমন দুষ্টু, ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয় নি। ওর সঙ্গে তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এসেছিল ?

একটু চমকেই উঠেছিল দিব্যেন্দু, বললে—কে বললে ?

তেমনি হাসতে হাসতেই প্রতিমা বললে—যেই বলুক না, সত্যি কি না বলো।

দিব্যেন্দু একটুক্ষণ থেমে তারপর বললে—সত্যি।

—হলো না কেন বিয়ে ?

দিব্যেন্দু বললে—অশোকা আমার মন বুঝতে পেরেছিল। নইলে এমন করে তোমাকে চিঠি লিখে, তোমার সঙ্গে আলাপ করে, তোমাদের বাড়ি গিয়ে, বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারত না।

প্রতিমার চোখ দুটি ছলছল করে এলো, বললে—ও যে এত বড়ো তা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। ওকে চিঠি লিখব।

দিব্যেন্দু একটু হেসে বললে—আর আমাকে ?

—তোমাকে ? বলে, চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, হঠাৎ করল কী প্রতিমা, মুখখানা কাছে এনে ওর মুখে চট করে ছুঁইয়ে দিয়ে দ্রুত ছুটে গেল অন্য দিকে, সম্ভবতঃ রান্নাঘরে, মায়ের কাছে।

প্রতিমা মার কাছে 'মা—মা' করে, কিন্তু মায়ের গাম্ভীর্য, মায়ের বিষণ্নতা যেন ঘুচতেই চায় না। সুনন্দার অবশ্য এখন আর অতোটা নেই, লক্ষ্য করছে দিব্যেন্দু।

এই ভাবেই দিন যায়। নির্মলেন্দুর ছুটি ফুরিয়ে যেতে সে চলে যাবে, কথা ছিল সে একাই যাবে, হঠাৎ মা এসে বললেন—আমিও যাবো।

—সে কী ?

মা বললেন—তোমার সংসার গুছিয়ে দিয়েছি, এবার আমাকে যেতে দাও। তোমার ওপর যেমন কর্তব্য আছে, তেমনি নির্মলের ওপর নেই ? আমি যাই, কেমন ?

দিব্যেন্দু কোন কথা বলেনি।

বোন এসে বললে—আমিও যাবো।

—কেন, তুই থাক না?

সুনন্দা বললে—বাবার শরীর খারাপ, আমি গিয়ে বাবাকে দেখতে পারব। এখানে থেকে কী আর করব বলো?

দিব্যেন্দুর মনে সেদিন একটা অভিমানই জেগেছিল বলা চলে। কিন্তু, আজ ভাবলে, ঘটনাটির পিছনে একটা তাৎপর্য খুঁজে পায় সে। নববধূকে ভিতরে ভিতরে সহ্য না করতে পারার দরুণই যে মায়ের ঐ হঠাৎ চলে যাওয়া, এটা বুঝতে কষ্ট হলো না। কিন্তু এর মধ্যে যে ভবিতব্যের একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ক্রিয়া করছে, সেটা তখন দিব্যেন্দু পারেনি বুঝতে। দিব্যেন্দু কেন, তার মা-বোনই কি বুঝতে পেরেছিল ভাল ক'রে?

ওঁরা চলে যাওয়ার পর বোধহয় লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছিল প্রতিমা। চোখ দুটো ফোলা-ফোলা, একসময় সে এসে দাঁড়ালো দিব্যেন্দুর কাছে, বললে—আমার ওপর রাগ করেই মা চলে গেলেন।

—না না, তা কেন?

প্রতিমা বললে—তুমি আমার স্বামী, তুমি ত আমাকে প্রবোধ দেবেই। কিন্তু আমি জানি, আমি কালো, আমি কুৎসিত, তাই মার আমাকে পছন্দ হয়নি?

একটু হেসে দিব্যেন্দু বললে—নবপত্রিকার ওপর বর্ষার প্রথম পরশ লাগলে কি তাকে কালো দেখায়? তোমার রঙ—যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ।

—যাও!—বলে ব্রীড়াভঙ্গি করে ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালো প্রতিমা।

দিব্যেন্দু ওর কাছে গিয়ে ওর দুটি হাত ধরে টেনে নিল কাছে, বললে - আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো।

প্রতিমা বললে—ওতো কর্তব্যের কথা, মনের কথাটা কী?

দিব্যেন্দু বললে—সে কি মুখে বলার? বুঝতে পারো না?

প্রতিমা খুশি হয়ে ওর কাছ ঘেঁষে এসে ওর বুকে মুখ লুকালো। তার পরে, একসময় হঠাৎ মুখ তুলে বলে উঠল—জানো, তোমার ঐ ট্রাঙ্কটা খুলে কী পেয়েছি?

—কী পেয়েছ!

—দেখবে?

বলে, ছুটে গেল সে পাশের ঘরে। এবং একটু পরেই নিয়ে এল টিনের একটা ছোট বাক্স। ওর কাছে সেটা নিয়ে এসে বললে—দেখছ না জিনিসটা কী?

দিব্যেন্দু বুঝেছে সেটা। বুঝেই বেদনাক্লিষ্ট কণ্ঠে বলে উঠল—রঙ।

—শুরু করবে আঁকা?

দিব্যেন্দু বললে—ওতে কাজ হবে না! পুরোনো হয়ে গেছে।

—তা হোক, দেখইনা চেষ্টা করে।

—বৃথা চেষ্টা।

প্রতিমা একটুক্ষণ থেমে থেকে বাক্সটা টেবিলের ওপর রেখে, ওর কাছে সরে এসে ত্বটি বাহুলতা দিয়ে জড়িয়ে ধরল ওর কণ্ঠদেশ, বললে—আমাকে আঁকো না গো?

—অত সহজ নয় তোমাকে আঁকা।

—কেন?

দিব্যেন্দু বললে—প্রচুর প্রস্তুতির দরকার, একথা বোঝো না কেন? আমি ত অনুশীলনও ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন ছাড়লে?

দিব্যেন্দু বললে—কাঠের ব্যবসায় খবরদারী করতে করতে শিল্পী-মনকে বাঁচিয়ে রাখা যায় কতক্ষণ। বোধ হয় সে মরে গেছে।

ও বললে—শিল্পী কি কখনো মরে?

দিব্যেন্দু ততক্ষণে বসে পড়েছিল চেয়ারের ওপর। এবার উঠে

দাঁড়ালো। বললে—ওসব কথা রাখো ত? তুমি কি করছ? একটাও কবিতা লিখেছ? নাকি, বিয়ে করে বর পেয়ে সব ভুলে গেলে।

লজ্জায় মুখখানা আরক্তিম হয়ে উঠল প্রতিমার, বললে—ভুলেছিই ত।

—তবে?

ঈষৎ ঝংকার দিয়ে প্রতিমা বললে—তবে আবার কী?

দিব্যেন্দু বললে—সংসার এমন জায়গা, এতে মেতে গিয়ে শিল্পী জীবনকে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। কী, লিখতে পেরেছ কবিতা?

মুখখানা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে প্রতিমা, ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা, রাঙা হয়ে আছে কপোলতল, অপরূপ দেখাচ্ছে ওকে।

মুগ্ধ অন্তর নিয়ে দিব্যেন্দু ওর আরও কাছে ঘেঁসে এলো, বললে—প্রতিমা।

ওর বাহুর ওপর মাথাটা রেখে, মুখ লুকিয়ে প্রতিমা বললে—আমি একটা নতুন কবিতা লিখছি।

—শোনাবে না?

—শোনাবার মতো নয়।

—কেন?

মুখটা একটু উঠিয়ে, অন্যদিকে তাকিয়ে, লজ্জা বিজড়িত কণ্ঠে মৃদুস্বরে প্রতিমা বললে—প্রতিটি রক্তকণা দিয়ে রচনা করছি সেই কবিতা। অতো সহজে দেখতে চাও?

দিব্যেন্দু ব্যাকুল হয়ে বললে—কী, বলো না? বুঝতে পারছি না যে?

—যাও! আবার মুখ লুকালো প্রতিমা, বললে—বুঝছেন সব, শুধু দুষ্টুমী।

আনন্দে যেন আত্মহারা হয়ে গেল দিব্যেন্দু, বললে—সত্যি?

প্রতিমা কোনো উত্তর দিল না। ওর মুখখানা দুহাতে জোর করে

তুলে ধরবার চেষ্টা করল দিব্যেন্দু। প্রতিমা মুখ তুলল, কিন্তু বুজে ফেলল চোখ দুটো। দিব্যেন্দু বললে—এই, মা জানে?

—না।

—তাহলে চিঠি লিখে দিই?

—দাও।

কিন্তু দিনের পর দিন গেল, শিশুর আবির্ভাবও হয়ে উঠল আসন্ন, এমন সময় ঘটে গেল দুর্ঘটনা। কোলকাতা থেকে ছোটভাইয়ের টেলিগ্রাম এলো—বাবা মারা গেছেন। হৃদরোগ।

দিব্যেন্দুর বাবা পূর্ণেন্দু বাবুর জীবনটা ছিল বিচিত্র। সারাটা জীবন কেটেছে দারিদ্র্যের মধ্যে, প্রাণপণ সংগ্রাম করে গেছেন তিনি। কিন্তু সব কিছুর অন্তরালে ছিল অদ্ভুত এক প্রসন্ন মন। কে কী-কাজ করিয়ে টাকা দেয়নি, মা কতো তাগাদা করেছেন, বলেছেন—তা বলে লোকটা তোমাকে ঠকিয়ে নেবে?

পূর্ণেন্দু বাবু হেসে বলেছেন—আমাকে কী ঠকাবে? ঠকছে সে নিজেই। আমার প্রাপ্য টাকা সে যদি না দেয়, তার দ্বিগুণ টাকা চলে যাবে তার অন্য দিক দিয়ে। তুমি দেখে নিও।

বাবার এই নিস্পৃহ ভঙ্গী ভালো লাগত না তার মায়ের। বলতেন —জানি না বাবা, কী দিয়ে মানুষটা তৈরী। কোনো-কিছুতেই হুঁস নেই। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেলাম।

এইভাবে, দিনের পর দিন, 'খাক' হতে হতে মা-বাবার মধ্যে সবার অলক্ষ্যে গড়ে উঠেছিল এক দুস্তর পারাবারের মতো দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। বাইরে থেকে সেটা ঠিক বোঝা যেতো না, কিন্তু দিব্যেন্দু ত বাইরের কেউ নয়, তার বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে যতই সে কঠোর জীবন-সংগ্রামের সম্মুখীন হতে লাগল, ততই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল তার কাছে।

বাবা গেলেন, দিব্যেন্দুর মনে হলো, যেন দুর্জয় অভিমান নিয়েই

তিনি চলে গেলেন। প্রতিমার তখন যা অবস্থা, তাতে করে তাকে নিয়ে ট্রেনে যাতায়াত করা বিপজ্জনক। তাই সেই পঞ্চানন বাবুর কাছেই গেল দিব্যেন্দু। পঞ্চানন বাবু এবং তাঁর স্ত্রীকে সব দেখা-শোনা করবার অনুরোধ জানিয়ে একাই কলকাতা রওনা হয়ে গেল সে।

এবং এক আধদিন ত নয়, শ্রাদ্ধ-শান্তি ইত্যাদি করে সে যখন ফিরে এলো তখন একমাসের বেশী সময় গেছে কেটে। তার জায়গায় কাজ করবার জন্য কলকাতার কেন্দ্র অফিস থেকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে পাঠিয়েছিলেন শ্রীপতি বাবু। প্রৌঢ় ভদ্রলোকের নাম কৈলাস বাবু, তাদের কেন্দ্র অফিসের পুরাতন কর্মচারী। কৈলাস বাবু অফিস করেছেন, কিন্তু থেকেছেন, না না, হোটেলেও নয়। থেকেছেন চৌধুরীর বাড়িতে।

দিব্যেন্দু সপ্তাহে একখানা করে পত্র ত দিতই, মাঝে মাঝে এক-খানার বেশিও দিতো। প্রতিমাও নিয়ম করে তার উত্তর দিয়ে গেছে। কিন্তু, শেষের দিকে তার চিঠি আর পায় নি দিব্যেন্দু। আর, পায় নি বলেই বড়ো উদ্বিগ্ন ছিল সে মনে মনে। যখন এসে সে পৌঁছল বাড়িতে, তখন প্রতিমা হাসপাতালে, একটি নবজাতক এসেছে তার কোলে, মা ও ছেলে ভালোই আছে।

কলকাতায় ভাইকে টেলিগ্রাম করে, অফিসে বসে কৈলাস বাবুর কাছ থেকে কাজ বুঝে নিয়ে, বিকেলে যখন সে হাসপাতালে গেল, তখন প্রতিমার কেবিনে ঢুকে যাকে দেখা মাত্রই সে চমকে উঠল, সে হচ্ছে—অশোকা।

প্রতিমা ক্ষীণ কণ্ঠে বললে—এসো এসো! অশোকাদি এসেছে দিন তিন চার হলো। ও-ই ত সব করেছে, হাসপাতালে নিয়ে আসা, কেবিনের বন্দোবস্ত করা—সব।

অশোকা হাসি-হাসি মুখে বললে—ওসব ফিরিস্তি থামাও ত? আগে সন্দেশ আদায় করে নি? শুধুই কি সন্দেশ, অন্য কিছু আছে না? কী দিয়ে দেখবেন ছেলের মুখ?

ভিতরে ভিতরে একটু অপ্রস্তুতই বোধ করল দিব্যেন্দু, ভাবল, সত্যি ত, বড়ো ভুল হয়ে হয়ে গেছে। এসব কথা একেবারেই মনে হয় নি। মুখে বলল—ছেলের মুখ দেখব বাড়িতে, এখন দেখে যাই রোগিনীকে।

অশোকা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে, বললে—দাঁড়ান আসছি।

দিব্যেন্দুর মুখের দিকে ভারী স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল প্রতিমা। পাশের টুলটা দেখিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে—বোসো।

দিব্যেন্দু ওর দিকে একটু ঝুঁকে নিম্নকণ্ঠে বললে—কই সে ?

মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠল প্রতিমার ঠোঁটের কোণে, সে মাথাটা দিলো খাটের অন্যদিকে, তারপরে তাব পাশে শোয়ানো একটি ছোট পুতুল মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—দেখতে পাচ্ছ না ? দোলনা থেকে এনে পাশেই শুইয়ে দিয়ে গেছে নার্স।

ছোট দেহটি চাদরে ঢাকা, ঘুমন্ত মুখখানি দেখা যাচ্ছে শুধু। কেমন যেন ফ্যাকাশে ফ্যাকাশে রঙ—নাক-মুখ চোখের পল্লব ত ভালই লাগছে দেখতে—ভ্রূ দুটো যেন আঁকা মনে হচ্ছে। মাথায় চুলও হয়েছে বেশ।

এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। ছোট এতটুকু মানুষটি যেন মুঠিবদ্ধ দুই শূন্য হাতে অনন্ত দাবী নিয়ে সংসারে এসে পড়েছে। অন্ধ আবেগ আর কী এক দুর্বার প্রেরণায় তাড়াতাড়ি সে প্রতিমার একখানা হাত তুলে নিলো তারপরে সেই হাতখানা মুখের কাছে তুলে নিয়ে এসে প্রগাঢ় চুম্বন মুদ্রিত করে দিলো সেই করতলে। অন্য সময় হলে প্রতিমা বলে উঠত—আহা, করছ কী, ছাড়ো! কেউ দেখে ফেলবে।

আজ কিন্তু সে তা বলল না, খুশি-হওয়া দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে রইল সে দিব্যেন্দুর দিকে, মুখে ফুটে উঠল এক অপূর্ব বিভা। যেন ওর চোখ দুটি বলতে চাইছে—সুখী হয়েছো তুমি ?

তারপরে, অনেকক্ষণ বসে রইল সে প্রতিমার পাশে, এটা ওটা অনেক কথাই বলল ওরা দুজনে, তারপরে সময় হতেই উঠে পড়ল, নার্সদের সঙ্গে কথা বলল, অফিসে গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করল, ফিরেও এলো বাড়িতে, কিন্তু এত সময়ের মধ্যে অশোকা ত ফিরে এলো না। সেই যে 'আসছি' বলে চলে গেল, আর এলো কই ?

এর পরে, সাত-আট দিন দিব্যেন্দু তার অফিসের কাজে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল, যে অন্যদিকে মন দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ল বলা চলে। বিকালে অবশ্য প্রতিমাকে দেখতে সে হাসপাতালে রোজই গেছে, কিন্তু অশোকাকে দেখতে পায়নি একদিনও। কথাটা প্রতিমাই একদিন তুলল, বলল—অশোকাদির সঙ্গে তোমার দেখা হয় ?

—না ত!

ও বললে—সেই যে 'আসছি' বলে চলে গেল, আর আসেনি।

দিব্যেন্দু বললে—আচ্ছা, খোঁজ নেবো'খন।

কিন্তু মুখে বললেও কাজে তা হয় নি। খোঁজ নেওয়া মানে, পঞ্চানন বাবুকে একটা টেলিফোন করে দেওয়া। কাজের চাপে সেটুকুও মনে থাকেনি। কৈলাস বাবু এর মধ্যে চলে গেলেন একদিন! কর্তব্যবোধে তাঁকে স্টেশনে তুলে দিতে গিয়েছিল দিব্যেন্দু, চৌধুরীও গিয়েছিল। চৌধুরীকে এড়িয়ে, ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে প্লাটফর্মের অন্যদিকে চলে গেলেন কৈলাস বাবু। তারপরে, এক জায়গায় এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন ভদ্রলোক, নিম্নকণ্ঠে বললেন—আচ্ছা দিব্যেন্দু বাবু, চৌধুরীকে আপনার কেমন লোক বলে মনে হয় ?

মুহূর্তে সতর্ক হয়ে গেল দিব্যেন্দু, বললে—কেন, ভালোই।

একটুক্ষণ থেমে থেকে কৈলাস বাবু বললেন—ওর ওখানে থাকতে হয়েছিল, বিশ্বাস করুন, শ্রীপতি বাবুরই গোপন নির্দেশে। নইলে—

বলেই, থেমে গিয়ে পুনর্বার নিম্নকণ্ঠে বলে উঠলেন তিনি—আমি বুড়ো হয়েছি, কাজ হয়ত ছেড়ে দেবো শীগ্‌গিরই একদিন। কিন্তু এতদিন ওঁদের ওখানে চাকরী করে দেখলাম অনেক, বুঝলামও অনেক। আপনার আত্মীয়, কিন্তু ব্যবসার ক্ষেত্রে এসে মানুষ যখন প্রতিষ্ঠা পায়, টাকাও করে, তখন তাদের মন হয়ে ওঠে অন্য রকম। সেই রকম মনের কাছে কোনো স্নেহও নেই, স্বার্থে ঘা লাগলে কাউকে রেহাই দেয় না ওরা। মানুষের চরিত্র এখানেই বিচিত্র হয়ে ওঠে। একটা কথা বলে যাই, চৌধুরী সম্পর্কে একটু সতর্ক থাকবেন। একে ত লোকটি ভালো নয়, তার ওপর—ভিতরে ভিতরে অসাধারণ প্রশ্রয় আছে শ্রীপতি বাবুর। নিন, আর দাঁড়ানোর দরকার নেই, আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে চৌধুরী। দেখছেন না? চলুন, অন্য কথা বলতে বলতে ফিরি। হাসপাতাল থেকে কবে নিয়ে আসছেন বৌমাকে?

দিব্যেন্দুর মনে চৌধুরীর কথাটা যেভাবে অনুপ্রবেশ করেছে, তাতে, অন্য প্রসঙ্গে চট্ করে তার পক্ষে আসা সহজ নয়। তাই, বেশ একটু সময় নেবার পর দিব্যেন্দু বললে—পরশু সকালে ছাড়বে বলছে।

—বেশ।

চলে গেলেন কৈলাস বাবু, এবং যথানির্দিষ্ট দিনে ঘরেও এলো প্রতিমা—ছেলে কোলে করে। তারপরে, ছোট একটা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করল দিব্যেন্দু, লোকজন অনেকে এলো। এমন কি এতদিন পরে অশোকাও এলো একটা গাঢ় সবুজবর্ণের সিল্কের শাড়ি পরে। তাকে দেখে কলরব করে উঠল প্রতিমা—এই এতদিনে এলে?

অশোকা মুখ টিপে হেসে ফেললে—আসল লোক এসে গেল, আমার আর প্রয়োজন কী?

এসেছিলেন পঞ্চানন বাবুও। নবজাতককে দেখে বললেন—এ যে

কোয়ালিটি চেঞ্জ করে দিয়েছে হে। সৌন্দর্যে বাপ-মাকে ম্লান করে দেবে!

একটা প্রসন্ন কৌতুকের ঢেউ পড়ল চারিদিকে ছড়িয়ে। দিব্যেন্দু বললে—টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করেছিলাম, নিজে যেতে পারি নি কাজের চাপে। গ্রহণ করেছেন দেখে ধন্য হয়েছি।

পঞ্চানন বাবু হাসলেন, বললেন—এখনো সব যায়গায় ইলেকট্রিক আসেনি, কিন্তু টেলিফোনটি এসে গেছে। কী অদ্ভুত জনপদ, তাই না?

অশোকা বললে—তা যাই হোক, টেলিফোনটা ছিল তাই ওঁর কণ্ঠস্বর শুনলে বাবা, নইলে শুনতে পেতে না।

হেসে উঠলেন পঞ্চানন বাবু, বললেন—ওরে, ফুলের সৌরভ কি ঢাকা যায়! ঐ যে শিশুটি এসেছে, ও ঠিক ডেকে আনত আমাদের! দিব্যেন্দু নিমন্ত্রণ করল কি করল না, সেসব হিসেব কে রাখে?

বুকের ভিতর থেকে যেন পাষাণ-ভার নেমে গেল। যাক, কিছু তাহলে সত্যিই মনে করেন নি পঞ্চানন বাবু।

আরও রাত হতে লাগল, অভ্যাগতরা একে-একে চলে গেছেন, পঞ্চানন বাবুও গেছেন চলে, যায় নি শুধু অশোকা। প্রতিমার সঙ্গে নানান গল্প করবার পর একসময় উঠে দাঁড়ালো সে, বললে—নিন, এবার উঠব। আমাকে একটু পৌঁছে দিয়ে আসবেন?

ওর আগেই প্রতিমা বলে উঠল—নিশ্চয়ই। যাও, এগিয়ে দিয়ে এসো অশোকাদিকে।

তারপরে টর্চের আলো ফেলে প্রায়ান্ধকার পথ দিয়ে যেতে-যেতে একসময় প্রশ্ন করে উঠল দিব্যেন্দু—মিস্টার গুপ্তেকে দেখলাম না যে?

অশোকা বললে—সে যে এখানকার চাকরী ছেড়ে দিয়ে ঘোরা-ঘুরির চাকরী নিয়েছে, এটা জানো না নাকি?

—জানি। দিব্যেন্দু বললে—কিন্তু ভেবেছিলাম, তিনি এখানে।

—না। অশোকা বললে—তিনি আপাতত পুণায়।

—পুণা? দিব্যেন্দু এক মুহূর্ত থেমে থেকে তারপর বললে—বাড়ি গেছেন তাহলে বলো? কিন্তু বধূকে বাপের বাড়িতে রেখে?

—বাপের আপত্তি হলো না বলে,—বলতে বলতে একটু যেন হাসল অশোকা, বললে—বাড়ি ঠিক উনি যাননি, কাজেই গেছেন। বাড়ি পুণা নয়, পুণা থেকে আরও দূরে, কোল্‌হাপুরের কাছে। কিন্তু সে-ও নামেই বাড়ি, কেউ থাকে না?

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। অশোকা বললে—ওর বুড়ো বাপ-মা সবাই মিলে কাশীতে বাড়ি কিনে সেখানেই বসবাস করছেন।

—আচ্ছা! দিব্যেন্দু বললে—তুমি কখনো গেছ কাশীতে?

—গেছি বইকি। অশোকা বললে—বাড়ির ছোট ছেলে, তার বউ আমি। শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করতে যাব না? তুমি ভাবো কি আমার সম্বন্ধে! আমার বধূজীবন খুব সাকসেসফুল।

দিব্যেন্দু হেসে বললে—অভিনন্দন জানাচ্ছি।

অশোকা বললে—তুমি খুব ভাগ্যবান কিন্তু। প্রতিমা সত্যিই ভালো মেয়ে। হ্যাঁ, ভালো কথা, তোমার মাকে নিয়ে এলে না কেন?

—চেষ্টা করেছিলাম। আসতে চাইলেন না।

অশোকা দাঁড়িয়ে পড়ল রাস্তার ওপর, বললে—নাতিকে দেখতেও ইচ্ছা হলো না তাঁর? নাতি হবে, তা ত তাঁর জানা ছিল? না কি জানাও নি?

—জানিয়েছিলাম। দিব্যেন্দু বললে—এমন কি, শিশুটি যে এসেছে, সে সংবাদও টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিয়েছি। আসলে মার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে ত? বাবা অবধি চলে গেলেন।

হঠাৎ ওর হাতটা চেপে ধরল অশোকা, বললে—সব বুঝতে পারছি, কিন্তু তবু মন সায় দিচ্ছে না। নাতির মুখ দেখলে অনেকটা সামলে নিতে পারতেন মনে হয়। তোমার টেলি পেয়ে এসে পড়লেই তাঁর পক্ষে ভালো হতো।

দিব্যেন্দু বললে—কাল কলকাতার চিঠি পেয়েছি। মা-ভাই-বোন তিনজনেই লিখেছে। সবাই খুব খুশি হয়েছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু, আপাতত আসতে কেউ পারছে না।

অশোকা ওর হাত ছেড়ে দিয়ে কী যেন ভাবছিল আপন মনে, বললে—এও হয়—এত আদরের নাতি, তোমার বাবা দেখে যেতে পারলেন না, সেই দুঃখেই তোমার মা এখন আসতে পারলেন না হয়ত।

—তা হতে পারে! বলে দিব্যেন্দু নীরবেই ওর পাশে পাশে হাঁটতে লাগল কিছুক্ষণ ধরে। প্রায় ওর বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে, এমন সময় অশোকা হঠাৎ আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। নির্জন—একেবারেই নির্জন পথ—প্রায় অন্ধকার বললেই চলে—পথের রেখা দেখতে হয় টর্চ জ্বেলে জ্বেলে। অশোকা আবার ওর হাতের ওপর হাতটা রাখল, বলল—ব্যক্তিগত কথাগুলি জিজ্ঞাসা করছি বলে মনে কিছু করছ না ত?

দিব্যেন্দু বললে—এইবার মনে করছি। তুমি ও কথাটা বললে কী করবে?

বোধহয় একটু হাসল অশোকা, বললে—যাক, অভয় পেলাম। এইবার একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? প্রতিমার সঙ্গে তোমার মায়ের কি একটা ছেদ হয়ে গেছে?

দিব্যেন্দু বললে—এর জন্যে এতো ভূমিকা করছিলে? আপাতত ঠিক ছেদ না হলেও, ভবিষ্যতে হয়ে যাবে। কারণ, প্রতিমাকে বধূ হিসেবে গ্রহণ করতে মা ঠিক প্রসন্ন মনে পারেন নি।

—অর্থাৎ, শাশুড়ী-বউয়ের মধ্যে যে একটা রেষারেষি দেখা দেয় প্রথম-প্রথম, সেটাই হয়েছে আর কী।

দিব্যেন্দু বললে—রেষারেষি? মানে—ঠিক তেমন—অর্থাৎ—ব্যাপারটা তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি অশোকা—

অশোকা বাধা দিয়ে বললে—আমি যথেষ্ট বুঝেছি, বিয়েটা আমারও হয়েছে ভুলে যাচ্ছ কেন? শাশুড়ী আমাদেরও আছে।

দিব্যেন্দু প্রশ্ন করলো—তোমারো কি—

—অবিকল। অশোকা বললে—ঐ যে, যে ভাষায় তুমি বললে—প্রসন্ন মনে গ্রহণ না করা—আমার বেল্মাতেও ঠিক তাই হয়েছে। তবে, এর মধ্যে ভরসার কথা এই যে, যাকে বিয়ে করেছি, সে লোকটা প্রসন্ন হয়েছে। সত্যি বাপু, এ রকম বউ পাগল-লোক আবার দেখা যায় না!

—তাই নাকি?

অশোকা বললে—তাহলে বলছি আর কী! এই যে দূরে গেছে, রোজ একখানা করে চিঠি দিতে হবে তাকে! আর জানই ত, শান্তিনিকেতনে-পড়া ছেলে, চিঠিতে আর যাই থাক না কেন, কাব্য থাকা চাই অজস্র।

—এ তো সুসংবাদ।

অশোকা বললে—তাইত বলছি। কিন্তু পথ ফুরালো, এসে গেলাম বাড়ি। এতরাত্রে আর পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম ক'রে কাজ নেই, এবার ফিরে যাও।

বলতে না বলতেই অনুচ্চ কণ্ঠে হেসে উঠল অশোকা, বললে—অমন স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইলে কেন, অবাক হলে? আমি যে কি রকম প্রগল্‌ভা হয়ে গেছি, এই দেখে অবাক হচ্ছো? বিয়ের পরে সব মেয়েই ওরকম একটু হয়ে থাকে, বউয়ের কাছে খোজ নিয়ে দেখ গে যাও।

দিব্যেন্দু বললে—খোঁজ আর নেবো কী। ঠাট্টাও বুঝতে পারব না, এমন অরসিক আমি নই।

—কে বললে অরসিক? অশোকা বললে—তাহলে, কিছুতেই রস নিবেদন করতাম না। বারে, আবার দাঁড়াল? বাসার একেবারে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দাও, নইলে বাবা-মা ভাববে কী? এত রাত্রে অন্ধকারে মেয়ে এলেন একা-একা ফিরে। তুমি যে সঙ্গে এসেছ, তা ওদের পক্ষে জানা দরকার। এসো।

তারপরে, আরও কিছুক্ষণ নীরবে চলবার পর, গেট্ খুলে ওদের বাঙলোবাড়ির ঠিক দরজায় পৌঁছে একটু উচ্চকণ্ঠেই বলে উঠল অশোকা—তাহলে এবার আসুন দিব্যেন্দুবাবু, অসংখ্য ধন্যবাদ। গুড নাইট!

গুড নাইট বলে, অদ্ভুত কৌতুক আর কৌতূহল অনুভব করেই সেরাত্রে বাড়ি ফিরে এসেছিল দিব্যেন্দু। সম্ভবতঃ ওরই জন্য অপেক্ষায় বসেছিল প্রতিমা, বললে—দিয়ে এলে অশোকাদিকে?

—এলাম।

প্রতিমা বললে—বড়ো ভালো মেয়ে এই অশোকাদি।

দিব্যেন্দু ওকে একটু কাছে টেনে নিলে, বললে—ভয় করছে না ত?

—কিসের?

দিব্যেন্দু বললে—যদি তোমার মানুষটিকে কেড়ে নেয়।

ভারী স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে গেল প্রতিমার মুখ, বললে—অতো কাঁচা মেয়ে ভেবো না আমাকে, আমি মানুষ চিনি। যে হাসতে হাসতে নিজের মানুষ অপরের হাতে তুলে দেয়, সে কি কেড়ে নেবার মানুষ?

স্তব্ধ হয়ে গেল দিব্যেন্দু। তারপরে একসময় শয্যায় শায়িত শিশুপুত্রটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠল সে—গোপাল ঘুমিয়েছে?

প্রতিমাকে রাগিয়ে দেবার এই এক অস্ত্র আবিষ্কার করেছে দিব্যেন্দু। বাচ্চাটাকে 'গোপাল' বললে নির্ঘাত রেগে যাবে প্রতিমা। হলোও ঠিক তাই। প্রতিমা তিরস্কারের সুরে বললে—আবার 'গোপাল' বলছ ওকে? সুন্দর একটা নাম ঠিক করে দাও না? কদিন ধরে বলছি।

দিব্যেন্দু গম্ভীর মুখে বললে—'গোপাল'-এর আগে 'পাঁচ' যোগ করে দাও।

—পাঁচগোপাল!

দিব্যেন্দু বললে—পাঁচগোপাল ত আর বলে না, পাঁচুগোপাল।

—ধ্যেৎ! তোমার সবতাতেই চালাকি!

হাসতে লাগল দিব্যেন্দু। তারপর একসময় হাসি থামিয়ে বললে—তুমি ত কবি, কবিতা লিখতে, তুমি একটা নাম ঠিক করতে পারলে না?

প্রতিমা খাটের ওপর ঝুঁকে পড়ল, ঘুমন্ত শিশুটির দিকে কিছুক্ষণ সস্নেহে তাকিয়ে থেকে তারপরে বললে—আমার রচিত কবিতা ত ঐ—ঘুমুচ্ছে।

কথাটা উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি হলেও দিনে দিনে অদ্ভুত সত্যি হয়ে উঠল তা। শিশুটি যেন সত্যিই দিনে দিনে প্রতিমার কবিতাই হয়ে উঠতে লাগল। ওকে সাজানো, ওকে আদর করা, ওকে ঘুম পাড়ানো, দিন-রাত ওকে নিয়েই বেশী সময় কাটতে লাগল প্রতিমার। ছ'মাস পেরিয়ে গেল, 'ত্ত-ত্ত-ব-ব্-বা' এসব বুলিও ফুটে উঠল শিশুর মুখে, একটি কি দুটি দাঁতও উঠল। প্রতিমা মুখে-ভাতের সব ব্যবস্থা করে ওকে একদিন বলে উঠল—এইবার মা আসবেন ত? আমার ভাইদের একজনকে ত আসতে লিখলাম, মামা না হলে মুখে ভাত হবে কী ক'রে।

তা শিশুর মামাদের একজন এসেছিল। এবং চিঠির কোন উত্তর না পাওয়ায় ভিতরে-ভিতরে অস্থির হয়ে উঠেছে দিব্যেন্দু, এমন সময়, অর্থাৎ মুখে ভাত হয়ে গেছে, শিশুর মামাও চলে গেছে, তার দিন সাত আট পরে, হঠাৎ কোনো খবর না দিয়ে এসে পড়লেন শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে—দিব্যেন্দুব মা।

একটু অবাকই হলো দিব্যেন্দু। বিশেষ করে মায়ের থান-পরা বিশীর্ণ চেহারা দেখে বুকের ভিতরটা কেমন যেন গুমরেই উঠল দিব্যেন্দুর। মা বললেন—কার সঙ্গে আসব? কেউ আসতে চায় না। হঠাৎ শুনলাম, শ্রীপতি আসছে। শোনামাত্রই চলে গেলাম শ্রীপতিদের বাড়ি। চলে এলাম। কোথায় দাদুভাই?

—কিন্তু, এ তোমার কি চেহারা হয়েছে ?

উত্তর দিলেন শ্রীপতিবাবু, বললেন—কাকীমার খুব অসুখ হয়েছিল, তুমি জানো না ?

—না ত!

ম্লান একটু হাসলেন দিব্যেন্দুর মা, বললেন—না, ওকে আর জানাইনি, মিছিমিছি ভাববে। খুব জ্বর। তা, ভুগলাম বেশ।

শিশুকে কোলে নিয়ে এসে প্রতিমা ওঁদের প্রণাম করলে। শ্রীপতি একটি গিনি দিলেন শিশুটির হাতে, বললেন—জেঠাবাবু এটা ধরো দেখি মুঠো ক'রে ?

শিশু 'গু-গু-ম্ম-ম্মা' !—বলে অনর্গল কিছু বলে গেল।

মাও দিলেন একটি জিনিস। বললেন—আন্দাজে একটি আংটি গড়িয়ে এনেছি, বৌমা, দেখত হাতে পবিয়ে ?

শিশুর অনামিকায় কিন্তু সুন্দর পরানো গেল আংটিটি। সেই প'রে আঙুল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নিজেই দেখতে লাগল শিশু, বলে উঠল—জ্য—জ্য—

শ্রীপতিবাবু তার ব্যাখ্যা করলেন সহাস্যে—অর্থাৎ, যে-যে এসেছে, সবাইকে আমি সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। বলে প্রাণখোলা হো-হো হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন শ্রীপতিবাবু। সব মিলিয়ে দিব্যেন্দুর মনটা এত উৎফুল্ল হয়ে উঠছে যে বলার নয়। কিন্তু, কাছের এই শ্রীপতি, আর অফিস ঘরের শ্রীপতিবাবু এক নয়। সারাদিন কেটে গেল, রাতও প্রায় দশটা, উল্‌টে পাল্‌টে অফিসের সব কাগজপত্র দেখতে লাগলেন তিনি। বিভিন্ন পার্টির কাজ ক'রে দিব্যেন্দু সবগুলি বিল্‌ করে, তার সবগুলি বিল্‌-এর নিচেই ম্যানেজার হিসাবে দিব্যেন্দুর সই থাকে। উনি সে-সব দেখতে দেখতে একসময় বলে উঠলেন—তুমি যখন কলকাতায় ছুটিতে গেলে, তখন ত কৈলাসবাবু এসেছিলেন। বিল্‌-এ তাঁর সই কই ?

দিব্যেন্দু বললেন—আমি রওনা হয়ে যাবার দিন তিন চার পরে

তিনি এসেছিলেন। অথচ, কতকগুলি বিল করা জরুরি ছিল। কারণ, বহু খুচরো পার্টি আছে, যারা ফ্লোটিং, এই আছে এই নেই, সব ভিন্ন জায়গা থেকে আসে ব্যবসার জন্য। তাই, চৌধুরীর পরামর্শেই আমি বোধহয় খানকুড়ি পঁচিশ ফাঁকা বিল্‌ফর্মের নীচে সই করে দিয়ে গিয়েছিলাম।

শ্রীপতি বললেন—কেন, তেমন হলে চৌধুরীও সই করতে পারত।

—সই ও করতে চাইল না!—দিব্যেন্দু বললে—ও -বললে, অ্যাটর্নী রয়েছে আপনার, আপনারই সই করে যাওয়া উচিত। আমিও আর অতো ভাবলাম না, বোঝই ত মনের অবস্থা কী রকম ছিল—বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কলকাতা যাচ্ছি। এসে দেখি যে সব ফাঁকা বিল্‌-ফর্ম আমি সই করে দিয়ে গিয়েছিলাম, সেইগুলিতেই কাজ মিটে গেছে, কৈলাসবাবুকে কোনো বিল্‌ ফর্ম আর সই করতে হয়নি।

—বুঝলাম। ব'লে আবাব নিবিষ্ট চিত্তে কাগজপত্র দেখতে শুরু করলেন শ্রীপতিবাবু।

বোধহয় দিন চার-পাঁচ আর ছিলেন তিনি। যে কদিন ছিলেন, অফিসে তন্ন তন্ন কবে দেখে গেছেন। দিব্যেন্দুব কাছে থাকলেও, একদিন একা চৌধুরীর ওখানে নিমন্ত্রণ খেয়ে এলেন। আপাত দৃষ্টিতে এমন কিছু নয়। কিন্তু এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাগুলির দিকেই যদি তখন সতর্ক দৃষ্টিপাত করত দিব্যেন্দু, তাহলে পবে যে শোচনীয় ব্যাপারগুলি ঘটেছিল, তা আর ঘটত না। তার মা এসেছে, মা আবার শিশুকে নিয়ে এমন মেতে গেছেন, প্রতিমাকে 'বৌমা-বৌমা' ক'রে কতো কাছে ডাকা তাঁর, কতো আদর করা! দেখেশুনে দিব্যেন্দুও এমন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল, যে, বাইরের সব ঘটনার দিকে আর মন দেবার অবসর ছিল না তার। কিম্বা, এই-ই হয়ত ঘটে যা অবশ্যম্ভাবী, তা এমনি ভাবে—সবার চোখের আড়ালে—ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে, এবং যেদিন তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, সেদিন

বিশাল হিমবায়ের অতর্কিত চঞ্চলতার মতো, হঠাৎ একদিন নেমে আসে, মানুষের জীবন-মন-ধ্যান-ধারণা সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়।

শ্রীপতিবাবুর সঙ্গে মায়ের যাবার কথা ছিল না। কিন্তু, কী আশ্চর্য, যেই তাঁর কানে গেল, চলে যাচ্ছেন শ্রীপতিবাবু, অমনি কী হল তাঁর মনের মধ্যে কে জানে, দিব্যেন্দুর কাছে এসে তিনি বললেন—আমিও যাবো।

—সে কী!

মা বললেন—না। ওদের ফেলে এসেছি, ওখানে আমার যাওয়া দরকার না?

এ একেবারে আকস্মিক ঘটনা। মা যাবেন শুনে প্রতিমার মুখ-খানা একেবারে যাকে বলে—শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। দিব্যেন্দুকে সে একটু একান্তে পেয়ে একেবারে আত্মহারা হয়ে একটা কথা জানাতে এসেছিল। বলতে এসেছিল—জানো? তোমরা কেউ পারলে না, খোকার চমৎকার একটা নাম দিয়েছেন মা। পার্থ। আমি নামটা একটু বাড়িয়ে করেছি—পার্থপ্রতিম। কেমন, ভালো না?

গম্ভীর কণ্ঠে দিব্যেন্দু বললে—মা চলে যাচ্ছে শ্রীপতির সঙ্গে।

—ওমা, কেন!

—জানি না।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপরে বিরস মুখে কাছ থেকে উঠে চলে গিয়েছিল প্রতিমা।

তার পরেব ঘটনা সামান্য। প্রতিমা কতো অনুনয় করলো, এমন কি কাঁদলও, মার মন তবু টলল না। চলে গেল সেইদিনই শ্রীপতির সঙ্গে। এবং আশ্চর্যের বিষয়, সেদিনই বেড়াতে এলো অশোকা। এ কয়দিন কতো ফোন করেছে দিব্যেন্দু, মায়ের নাম করে কতোবার আসতে বলেছে। নানান অজুহাত দেখিয়ে সে-সব এড়িয়ে গেছে অশোকা। তাই, এমন সময় ও হঠাৎ এসে পড়ায় চম্‌কে উঠল দিব্যেন্দু, বলল—তুমি! মা আজ চলে গেল।

—জানি।

মুখ তুলে দিব্যেন্দু তাকাল ওর দিকে। বললে—এর মধ্যেই জানলে কী করে তুমি ?

প্রতিমা কাছেই ছিল। অশোকা বললে—আপনাদের সব খবরই আমি রাখি এখানে এসে।

—কী করে ?

অশোকা বললে—কী মুশকিল দেখত প্রতিমা! বাড়িতে তোমার রাঁধুনী নেই, চাকর নেই ? তারা বাইরে বেরোয় না ?

দিব্যেন্দু বললে—ও, এইভাবে সব জানতে পারো তুমি!

অশোকা একটু হাসল শুধু, কিছু বলল না। প্রতিমা বললে—মা তোমার নাম করছিলেন অশোকাদি। তুমি এলে না কেন এর মধ্যে ?

—সময় পেলাম না।

ইতিমধ্যে পাশের ঘর থেকে, খোকা, অর্থাৎ প্রতিমার পার্থপ্রতিম, কেঁদে উঠতেই প্রতিমা ছুটে চলে গেল তার কাছে।

অশোকা বললে—মনে হলো, আজ তোমাব কাছে বেড়াতে এলে মন্দ হয় না।

দিব্যেন্দু বললে—'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল, বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল'! সত্যি অশোকা, মনটা আজ খারাপ হয়ে আছে, তুমি এলে বলে আবার খুশি খুশি লাগছে।

অশোকা মুখ টিপে হাসল, বললে—আমি কে ? প্রতিমাই ত রয়েছে।

দিব্যেন্দু বললে—প্রতিমা স্ত্রী, সে ত আছেই। তোমার মতো বন্ধুও দরকার।

অশোকার চোখের কোণে তখনো বুঝি দুষ্টুমীর ভাব খেলা করে বেড়াচ্ছে, বললে—কেন ? আমি খুব সুন্দরী মেয়ে বলে ?

কথাটায় কৌতুক অনুভব করেই দিব্যেন্দু ওর মুখের দিকে তাকালো পূর্ণ দৃষ্টিতে। অশোকা তখন হাসছে, নিম্নকণ্ঠে বললে—বন্ধু থাকতে

চিরজীবন রাজী আছি, কিন্তু খবরদার, প্রেম-ট্রেম করতে এসো না যেন।

ওর কথার ভঙ্গীতে সহজভাবে হেসে উঠল দিব্যেন্দু, বললে—তোমার খালি ঠাট্টা।

অশোকা বললে—যাক, এতক্ষণে মনের মেঘ কাটল, রোদ্দুর উঠল, এবার আমি যাই।

বলে, সত্যি সত্যি উঠে দাঁড়ালো অশোকা। দিব্যেন্দু তাড়াতাড়ি বললে—সে কী! এরই মধ্যে যাবে কী? বোসো বোসো।

—বসবার কী উপায় আছে? অশোকা বললে—পুনায় চিঠি লিখতে হবে না? যাই রবীন্দ্রনাথ ওলটাই গিয়ে।

—কেন! এর জন্য রবীন্দ্রনাথ কেন?

অশোকা বললে—রবীন্দ্রনাথ কীজন্য নয় মশাই। সব ব্যাপারেই ত রবীন্দ্রনাথকে দরকার হয় দেখি! কথা বলছি কী ভাষায়? একটু আগেই যে দুঃখের বরষায় বলে উঠলে সুন্দরী বান্ধবীকে দেখে, ও কার গানের চরণ? তবে? দোষ করেছে যেন আমার ঐ বেচারী স্বামীটি? বুঝলে না ত? প্রত্যেক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিতেই হবে, নইলে কিছুতেই মন উঠবে না বাবুর! ভাগ্যিস রবীন্দ্রনাথ বাঙালী হয়ে জন্মেছিলেন, তা না হলে ভদ্রলোক কি এই বাঙালী কন্যাটিকে আর পছন্দ করতেন? দায় পড়েছে তাঁর!

অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে অশোকা, এর মধ্যে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল প্রতিমা। বললে—নাও অশোকাদি, কোলে নাও একটু আমার পার্থকে।

—পার্থ! অশোকা বললে—ছেলের নাম পার্থ রাখলে বুঝি? অর্থাৎ অর্জুন। অর্জুনের মত বীর হোক, কিন্তু অর্জুনের মত দক্ষিণ নায়ক যেন না হয় ছেলে।

দিব্যেন্দু ভেবেছিল, কথাটা বোধ হয় প্রতিমা বুঝবে না, কিন্তু

কবিতা লিখবার অভ্যাস ছিল ওর, বই পড়ারও অভ্যাস ছিল, সুতরাং কথাটার অর্থ বুঝতে ওর কষ্ট হল না। বুঝে একটু লজ্জাও পেল। অশোকার কোলে ছেলেকে তুলে দিতে দিতে প্রতিমা বললে —তখন নায়িকা খুঁজবার ভার নেবে পিসী। আমার ভাবনা কী?

ছেলে কিন্তু নিশ্চুপেই গেছে পিসীর কোলে, গিয়ে ওর গলার মটরদানার হারটা নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। অশোকা দুষ্টুমি করে জনান্তিকে প্রতিমাকে বললে—দেখেছ প্রতিমা, ছেলের কোন-দিকে নজর?

ওরা হেসে উঠল। দিব্যেন্দু কথাটা শুনতে পেয়েও যেন শুনতে পায় নি, এমন ভান করে বসে রইল চুপচাপ। রাঁধুনীর ডাক শুনতে পেয়ে 'আসি' বলে চলে গেল রান্নাঘরে। ছেলে তখন 'যাই-যাই-বেই-বেই' প্রভৃতি অনেক কথা বলছে পিসীকে, আর ঘরের দরজার দিকে আঙুল দেখাচ্ছে।

দিব্যেন্দু একটু হেসে বললে—ওর কথা বোঝার আশা জলাঞ্জলি দাওনি ত? ও কী বলছে, বোঝবার চেষ্টা কর।

—আহা, বুঝি নি যেন। বাইরে যেতে চাইছে, এইত? বলেই অশোকা ছেলের গালে একটু চুমু খেয়ে বললে—না-না, তুই বেই-বেই না, বাবা বেই-বেই। অর্থাৎ তুমি মার কাছে থাকো, বাবা যাবে আমাকে পৌঁছে দিতে।

—আমি ত এক পায়ে খাড়া। বলেই উঠে দাঁড়াল দিব্যেন্দু, বললে—টর্চটা নিয়ে নিই। রাত্রিবেলা।

- ওমা, তা বলে এখখুনি। প্রতিমা আসুক।

—না, তোমার আবার পত্র লেখার আসর আছে ত। বলে ধপ করে তার চেয়ারটিতে আবার বসে পড়ল দিব্যেন্দু।

প্রতিমা অবশ্য এল একটু পরেই চা নিয়ে। তাবপরে, একথা সেকথার পর উঠে পড়ল একসময় অশোকা, বললে—আর না, তোমার কর্তাটিকে একটু নিয়ে যাচ্ছি প্রতিমা, একটু পৌঁছে দিক।

প্রতিমা বললে—নিশ্চয়ই অশোকাদি। যাও, পৌঁছে দিয়ে এস।

কিছুদূর পর্যন্ত নিঃশব্দে পথ চলার পর অশোকা চলার গতি একটু থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল—আচ্ছা, এবার একটা কথা বল ত? তোমার সেই ছবি-আঁকতে চাওয়া মন আজকাল কী বলে?

দিব্যেন্দু একটু থেমে থেকে তারপর বললে—ঠিক আঁকতে চাওয়াটাই বড় কথা নয়। বড় কথা, মনের ক্লিষ্টভাব। আজকাল আমার মনে হয়, এটা সবারই মনে আসে। সবার মনই হাহাকার করে ফেরে, 'হেথা নয়, অন্য কোনখানে'। আমাদের জীবনের এই-ই ত ট্রাজেডি। 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'। এর ওপরে মানুষের পারিপার্শ্বিক যদি যায় তার প্রতিকূলে, তাহলে তার মনের অবস্থা হয় শোচনীয়।

—তোমার শোচনীয় হয়েছে নাকি? ছেলে রয়েছে, বউ রয়েছে—

দিব্যেন্দু বললে—ছেলে আর বউ-ই ভাগ্যের কাছে আমার বড় প্রাপ্তি। কিন্তু যে কর্মক্ষেত্রের চক্রে এসে পড়েছি, এখানে আমি হাঁপিয়ে উঠি মাঝে মাঝে। পুরুষ মানুষ, কাজে উৎসাহ আর আনন্দ অবশ্যই পাব, কিন্তু যখন দেখি, আমার কোন কিছুই মূল্য পাচ্ছে না, আমাদের চারিদিকের আকাশ কুটিল সন্দেহ আর সংশয়ের মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, তখনি মনটা বিষণ্ণ হয়ে যায়।

ঠিক আগের মতই পথের মাঝে হঠাৎ একসময় দাঁড়িয়ে পড়ে অশোকা, ওর হাতে হাতখানি রেখে বলে—বাবার কাছ থেকে কিছু কিছু শুনছিলাম, এই আবর্ত থেকে ছিটকে সরে যেতে পারলে তোমার পক্ষে ভাল হতো।

—কী করে ছিটকে পড়ব? চাকরি পাব কোথায়? বলেই, একটু হালকা সুরে দিব্যেন্দু এবার বলে উঠল—ওটা হতে পারত, যদি তোমাকে বিয়ে করতাম।

বোধহয় হাসল অশোকা, বললে—সে চান্স যখন মিস করেছ তখন আর আপশোস করে লাভ কী?

তারপরেই, স্নেহকোমল কণ্ঠে সে বলে উঠল ওর হাতে একটু চাপ দিয়ে—না, এই যা হয়েছে, এই বেশ। কলকাতায় প্রতিমাকে গিয়ে দেখেছিলাম ত? ও তোমাকে না পেলে বাঁচত না।

দিব্যেন্দু নিশ্চুপে আবার পথ চলছে ধীর পদক্ষেপে। অশোকা ওর মুখের ভাব লক্ষ্য করবার চেষ্টা করে বলল—কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? এরকম হয়, এক একটি মেয়ে থাকে, ভালবাসার পাত্রকে না পেলে ছিন্নমূল তরুলতাটির মত একেবারে শুকিয়ে যায়।

—আর, তুমি?

অশোকা আপন মনেই বুঝি একটু হাসল, বলল—আমার কথা ছেড়ে দাও। আমি যতটা যুক্তিবাদী, ততটা ভাবপ্রবণ নই। আসলে, তুমি যা ছিলে, তাই আছ আমার কাছে।

নির্জন পথটার ওপরে এবারে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রথমে দিব্যেন্দু, বললে—কী ছিলাম?

অশোকা বললে—মুখ ফুটে বল দেখি কী ছিলে?

—প্রেমিক!

এবারও বুঝি হাসল অশোকা, বললে—কথাটা মন্দ লাগছে না শুনতে! বল। এখনও ওকথা বলে যেতে পার। আপত্তি করব না। তবে 'বন্ধু' বললে আরও নিশ্চিন্ত হতাম।

—বন্ধুই ত!—দিব্যেন্দু বললে—এমন বন্ধু আর কে আছে আমার। যখন বিপদ আসছে জীবনে, তখনি দেখি কোথা থেকে এসে পড়েছ তুমি। এ এক আশ্চর্য যোগাযোগ নয়? কিন্তু, তুমি আজ তবুও সমস্যায় ফেলেছ আমাকে! আমি যা ছিলাম আজও তা আছি, কথাটা কী ঠিক হল? সেদিন যত কাছাকাছি হয়েছিলাম দুজনে—

—কত আর কাছাকাছি!—অশোকা বললে—এবার মুখ ফুটে আমি তা বললে, তুমি লজ্জা পাবে। যদিও বলতে তোমার কাছে আমার আটকাত না। কিন্তু, ওদিক থেকে কথাটা খুবই তুচ্ছ। আজ তোমাকে নিশ্চয়ই সেই আগের মতন আমাকে নিয়ে মেতে

উঠতে দেব না, তবে, এভাবে মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে পথ চলতে আমার বাধা কী? তোমার হাতটা মাঝে মাঝে টেনে নিই দেখে লজ্জা পাও নাকি? দরকার হলে, আমার হাতখানাও তুমি নিজে থেকে তুলে নিতে পার। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

দিব্যেন্দু বললে—আমি বলছি, তা-ও বা কেন?

অশোকা বললে—কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। হাত ধরাও যা, না ধরাও তা। কী জান, আজকের দিনে মেয়েদের 'চেসটিটি' সম্বন্ধে তোমাদের ধারণাটা যত শীগগির পার বদলে ফেল। কলকাতার রাস্তার ভীড়ের মধ্যে চলতে গিয়ে যে ভাবে মাঝে মাঝে আমরা নিষ্পেষিত হই, তা ত তুমি এখান থেকে টের পাও না। অথচ, আপত্তি করেও লাভ নেই। কতো অশান্তি কবব? কিন্তু এটুকু জেনো, তাতে আমাদের 'চেসটিটি'র একটুও হানি হয় না। এই যে তোমার হাত ধরছি, এতে কি আমার 'চেসটিটি'ব হানি হচ্ছে? আমার স্বামীর কাছে আমি সমানই একনিষ্ঠ আছি। এবং একনিষ্ঠ যে আছি, বিশ্বাসঘাতকতা যে করছি না, একথা আমি ছাড়া আমাব সম্বন্ধে আর কে বড় করে জানবে?

অবাক হয়েই ওর কথাগুলি শুনছিল দিব্যেন্দু, যে সব কথা ও বলছে, তাতে যুক্তি আছে, কথাগুলি গ্রহণ করাও কঠিন নয়, কিন্তু অবাক হচ্ছিল, ওর কথা বলার সহজ ধরন-ধারণ দেখে। কত পরিবর্তনই না মানুষের হয়। প্রথম যখন ওর সঙ্গে আলাপ হয়, কী রকম লাজুক প্রকৃতিরই না ছিল সে।

অশোকা এতক্ষণ থেমে থেকে কী যেন ভাবছিল, এবার কতটা আত্মগত ভাবেই বলে উঠল—কাল চলে যাচ্ছি, জান?

—কাল!

ও ফিরে তাকাল ওর দিকে, বলল—হ্যাঁ। কালই। সকালের ট্রেনে।

—কোথায় যাবে? পুনায়?

অশোকা বললে—না, বোম্বে। ওর ত আজকাল ঘোরাব চাকরী।

বলিনি তোমাকে। আপাতত বোম্বে, পরে আবার কোথায় যাব জানি না।

—একাই যাচ্ছ ?

একটু হাসল অশোকা, বললে—হ্যাঁ, দোকা কোথায় পাব ?

—পারবে ?

—ওমা, কেন পারব না !

আবার চলা শুরু করল তুজনে। অশোকার বাড়ি যেতে যে শেষ বাঁকটা পড়ে, সেই বাঁকটা পেরিয়ে যাবার পর অশোকা দাঁড়িয়ে পড়ল আবার, বললে—দাঁড়াও, আবার কবে দেখা হবে জানি না ত ? একটা প্রণাম করে নিই।

দিব্যেন্দুর পায়ে ছিল স্যাণ্ডেল, নত হয়ে ওর পায়ের আঙুলে আঙুল বুলিয়ে ওকে প্রণাম করল অশোকা। অদ্ভুত এক স্নিগ্ধ স্পর্শ, হাতের মধ্যে হাত এসে পড়লেও যে স্পর্শ পাওয়া যায় না।

ও উঠে দাঁড়িয়ে দিব্যেন্দুর মুখেব দিকে তাকিয়ে ভারী গলায় বললে—কোনবার কোন কষ্ট হয় না, আজ হচ্ছে। অথচ, যাচ্ছি যিনি আমার সব থেকে প্রিয়, তাঁরই কাছে।

—কেন, কষ্ট কেন ? বাবা-মাকে ছেড়ে যাচ্ছ বলে ?

—না, তা নয়,—অশোকা বললে—সে কষ্ট প্রত্যেক মেয়েকেই সইতে হয়। তার জন্যে নয়। কষ্ট তোমার জন্য, প্রতিমার জন্য, পার্থপ্রতিমেব জন্য। কেন যেন আমার মনে হচ্ছে, আমার এখন না গিয়ে, কিছুদিন থেকে গেলেই ভাল হত।

—কেন বলো ত ? এমন মনে হচ্ছে কেন ?

—কী জানি।—অশোকা বললে—এরকম আবার যে কারুর মনের অবস্থা হতে পারে তা কি কোনদিন জানতে পেরেছি এর আগে ? বিয়ের পর, গোত্রান্তর ত নয়, জন্মান্তরও হলো আমার। জন্মান্তরের পর যেন অনেক কিছুই ভিতরে ভিতরে জানতে পারছি।

বলে একটুক্ষণ থেমে আবাব বললে—শুনবে একটা কথা ? যখনই

আমার মনটা তোমাদের জন্য অস্থির হয়েছে, তখনি দেখেছি, তোমার জীবনের একটা-না-একটা কিছু ঘটেছে। এবারে বাপের বাড়িতে এলাম, মনটা খুব খারাপ ছিল, খালি মনে পড়ছিল তোমার কথা নয়, যতটা—প্রতিমার কথা। এখানে পৌঁছনোমাত্রই এলাম তোমাদের বাড়িতে, দেখি, তুমি বাড়ি নেই, প্রতিমা একা বিছানায় শুয়ে কাতরাচ্ছে। চোখ দিয়ে জল পড়ছে বেচারীর। বুঝলাম ব্যাপারটা। হাসপাতালে ফোন-টোন করে, মানে, তোমার যা করনীয় সে সবই করে যেতে হলো আমাকে। তা করবার জন্য কিছু নয়, আমার মনের এই দিকটার কথা ভাবছি। সেই আগে হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল তোমার কথা মনে পড়ে, তারপরেই তোমার বিপদ ঘটল—তোমার বাবা চলে গেলেন। সেইজন্যই, আমি এত ভাবছি, তা জানো ?

দিব্যেন্দুর কাছেও এ এক আবিষ্কার। ওর হাতটা এবার সে নিজেই হাতের মধ্যে তুলে নিলো, বললে—তোমার কথা শুনে আমারও যে ভয় করছে। থেকেই যাও না তাহলে ?

স্নেহসিঞ্চিত কোমল কণ্ঠে অশোকা বললে—তা হয় না, জানো ? লোকটি বড়ো কাতর হয়ে পড়েছে। কাল যে চিঠি এসেছে, তোমাকে বলতে সংকোচ করব কেন, পড়তে পড়তে আমার চোখে জল এসে গেল। এমন কর্মী পুরুষ, অথচ আমাকে ছাড়া বোধ হয় দুনিয়ার কিছু জানে না। যাই, কেমন ? তুমি সতর্ক থেকো। আর, কিছু হলেই চিঠি দিও। ঠিকানা প্রতিমার কাছে দিয়ে এসেছি। বাবার কাছ থেকে যেটুকু শুনেছি, তাতে মনে হয়, তোমার মালিকরা তোমাকে বিপদে ফেলতে পারেন।

সেদিন কথাটা মনে লাগলেও কথাটার ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেনি দিব্যেন্দু, অশোকার বন্ধুত্বের আন্তরিক স্পর্শ টাই সেদিন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল ওর মনে। সেই স্নিগ্ধতার সৌরভই যেন সারা

অন্তরে গিয়েছিল ব্যাপ্ত হয়ে। নীরব প্রেম চিরযুগই পুরুষের কাছে অনির্বচনীয় আস্বাদ এনে দিয়েছে, কিন্তু, এযুগে যেটা সুদূর অতীতের মতো আবার নূতন করে দেখা দিয়েছে, সেটা তুচ্ছ নারীর বন্ধুত্ব। কালিদাসের কালে জন্ম নিলে এ বন্ধুত্বের স্পর্শ পাওয়া যেতো বলে কল্পনা করা যায়, কিন্তু, কেমন সে বন্ধুত্বের রূপ। অশোকা তাকে যেন হাত ধরে মাঝে মাঝে নিয়ে যায় সেই যুগে, যে যুগে ভারতীয় নারীত্বের স্বরূপ ছিল ভিন্নতর। দিব্যেন্দুর মনে হতে লাগল, এই সব অশোকাদের হাত ধরে আবার আসুক না ফিরে সেই সব অতীত স্বপ্নের হারানো দিনগুলি। ভাবতে ভাবতে ওর হঠাৎ ইচ্ছা হলো, বাড়ি ফিরে গিয়ে এই মুহূর্তে রঙ আর তুলি নিয়ে বসলে কেমন হয়! আর্ট সমালোচকদের কাছে অত্যন্ত হাস্যকর বস্তু হবে হয়ত। কারণ, আর্টের ব্যাপারে তার যে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত নেই। আগে আগে অন্তরের তীব্র এক প্রেরণায় সে আঁকতে বসত যা খুশি, 'সিপিয়া' রঙটা তার ছিল বড়ো প্রিয়, সেই রঙটাই পটভূমিকায় সর্বাঙ্গ জুড়ে বসত। কখনো মনে হতো, গাঢ় মেঘ, কখনো মনে হতো, আবছা-আবছা অন্ধকার রাত্রির এক রহস্যময় রূপ, আবার কখনো সে করত কী, গাঢ় রঙ্ টেনে টেনে—লাল-নীল-কালো-সবুজ সব পাশাপাশি বসিয়ে এক কিম্ভুত ছবি এঁকে বসত সে। প্রথমে সরলরেখা টেনে টেনে সে আকত এক অতিকায় জ্যামিতিক পুরুষের চেহারা; মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত। প্রতিমা তখন ছোট ছিল, ফ্রক ছেড়ে সবে শাড়ি ধরেছে, দুপদাপ পা ফেলে সে আর যখন-তখন আসে না তাদের বাড়ি, মাঝে মাঝে আসে, তা-ও যেন সতর্ক পদবিক্ষেপে, সন্তর্পণে, ভয়ে ভয়ে। সে এসে ছবি দেখে বুঝত না কিছুই; বলত—কী এটা?

গম্ভীরমুখে দিব্যেন্দু বলত—পুরুষমানুষ।

চোখ বড়ো বড়ো করে ছবিটা ভালো করে তখন দেখত প্রতিমা, কী বুঝত সে কে জানে, বলে উঠত—রঙ করবে না?

—রঙ লাগবে?

সে তার বেণী তুলিয়ে বলে উঠত—ওমা, রঙ লাগবে না? রঙ না লাগালে ছবি হয়?

কথাটা খুবই মনে ধরেছিল দিব্যেন্দুর, সে অমনি করল কী, একটু ভেবে নিয়ে, পাশাপাশি সব গাঢ় বর্ণের রঙ লাগাতে শুরু করল, মুখ থেকে বুক, বুক থেকে কোমর পর্যন্ত. জ্যামিতিক পুরুষটির মুখে-বুকে পাশাপাশি সব রঙ—লাল—নীল—সবুজ—কালো!

প্রতিমা তার গা ঘেঁষে দাঁড়াত, বলত—ও বাবা, ভুত নাকি!

কথাটা আজও মনে পড়ে। ছবিটা সে তার বাক্সে যত্ন করে রেখেও দিয়েছিল অনেক দিন। বয়স যখন আরও বাড়ল, তার সেই আগেকার চাকরীতে বহাল হল, সেই সময়, ছবিটা বার করে দেখতে দেখতে তার মনে হয়েছিল, কী যেন একটা অর্থ এসে গেছে ছবিটার মধ্যে। পুরুষের অন্তরের চেহারা যদি ধরা চাই, ত, নানান রঙ সেখানে খেলা করে নাকি?

ছবিটা তার কাছে আজ আর নেই। চাকরী ছেড়ে এ চাকরীতে আসবার ঠিক আগে, ওটা বার করে, কী খেয়ালে যেন ছিঁড়ে ফেলেছিল টুকরো টুকরো করে!

তারপরে আজ এই এতকাল পরে, তার মনে হল, আবার আঁকি। এবার পুরুষ নয়, নারী। জ্যামিতিক এক পূর্ণ নারীমূর্তি। আগাগোড়া কতগুলি সরলরেখার সমষ্টি। তার ওপরে সে নানান রঙ দেবে না, দেবে ছুটিমাত্র পাশাপাশি রঙ—একটি নীল, একটি লাল—একেবারে মাথা থেকে পা পর্যন্ত। অত্যন্ত সাধারণ ছুটি রঙ কিন্তু অসামান্য তার তাৎপর্য। যেন অশোকারই অন্তরের প্রতিচ্ছবি। একদিকে সে গুপ্তের প্রেমিকা ও প্রেয়সী, অন্যদিকে সে দিব্যেন্দুর বন্ধু, না-না, বান্ধবী শব্দটা চিন্তায় আনতেও ভাল লাগছে না, বন্ধুই ভাল। কিন্তু, লাল নীল তুই রঙের কোনটা কার জন্য, এবং কোনটা আগে, লাল, না নীল? কোনটা বাঁদিকে বসাবে, লাল, না নীল?

এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত চিন্তার মধ্য দিয়ে কাটতে লাগল কয়েকটা দিন। অশোকা যথানির্দিষ্ট দিবসেই প্রস্থান করেছে, সেটা শুনেছিল সে পঞ্চাননবাবুর কাছ থেকে। ঐ ঘটনার দিন তিনেক পরে বেড়াতে এসেছিলেন ওঁরা, স্বামী স্ত্রী। চলে যাবার সময়, পঞ্চাননবাবু ওকে ডেকে বললেন—কী হে দিব্যেন্দু, খুব কাজ পড়েছে বুঝি? অরণ্যে-অরণ্যে খুব ট্যুর করছ।

—না, এইবার শুরু করব। আপনিও ত যাবেন। ইজারার জন্য ডাক শুরু হবে ত এইবার।

পঞ্চাননবাবু একটু হাসলেন, আর কিছু বললেন না। যে প্রসঙ্গে তুললেন, সেটা অন্য কথা। বললেন, তোমার বাচ্চাটার সর্দি-কাশি হয়েছে আজ কদিন?

দিব্যেন্দু একটু ভেবে বললে - দিন তিন চার। আগে তেমন ছিল না, কাল থেকেই দেখি একটু বেড়েছে।

— কী খাওয়াচ্ছ?

দিব্যেন্দু বললে - আমার রাঁধুনীটিকে দেখেছেন ত? বুড়ী মতন? সেই ত বাচ্চাকে রাখে সব সময়। সে ঐ বাসকপাতা এনে রস করে খাইয়েছে।

আমাদের কথা বোধ হয় কিছুটা শুনতে পেয়েছিল প্রতিমা! সে এগিয়ে এসে বললে —বাসকপাতার রস আর মধু।

পঞ্চাননবাবু বললেন—তা অবশ্যি ভাল! কিন্তু, কাশিটা ভাল মনে হচ্ছে না।

ওরা চলে গেল, কিন্তু, প্রতিমার আর উদ্বেগের অন্ত রইল না ছেলেকে নিয়ে। বললে—দেখ না, খোকনের গা গরম গরম লাগছে। জ্বর হয় নি?

এগিয়ে গিয়ে গায়ে হাত দিল দিব্যেন্দু। একটু গরম গরম, কিন্তু ও এমন কিছু নয়! খোকন একটু কাশল! প্রতিমা বললে—দেখলে কেমন ঘড়ঘড়ে কাশি!

—ও কিছু নয়! সেরে যাবে। দিব্যেন্দু বললে—বিমলা কোথায়?

বিমলা সেই প্রৌঢ়া রাঁধুনীটির নাম। সম্বলপুরে তার বাড়ি, কিন্তু বাঙলা বলতে পারে।

প্রতিমা বললে—রান্না সেরে রেখে, আজ একটু সকাল সকালই চলে গেছে কী দরকার পড়েছে যেন!

খোকন ততক্ষণে দিব্যেন্দুর কোলে এসেছে ঝাঁপিয়ে। এসে, দুলে দুলে বলতে লাগল তার মায়ের দিকে তাকিয়ে—

বাব্বা—বাব্বা!

প্রতিমা ছেলের দিকে তাকিয়ে ওর গাল দুটি চেপে দিয়ে বলতে লাগল—ইস্! খোকনেরই যেন বাবা আছে, আর কারুরই যেন নেই, আমারও বাবা আছে, কলকাতায়।

খোকন আরও জোরে জোরে দুলতে লাগল, বললে—বাবা।

দিব্যেন্দু বললে—এখনও ঘুমোও নি, খোকন?

ওর মা বললে—এক ঘুম দিয়ে এই উঠল! কিন্তু কি বলে গেলেন ওরা? অশোকাদি নেই যে, পরামর্শ করি।

দিব্যেন্দু বললে—ঠিক আছে, কালই ডাক্তারকে খবর দিচ্ছি।

ওখানে বাঙালী কোন ডাক্তার ছিল না, তাদের অসুখে যাকে তারা বরাবর ডাকত, তিনি খুব হাসিখুশি মিশুকে লোক, অবসর সময়ে লাইব্রেরি ক্লাব সভা সমিতি পূর্ণিমা সম্মিলন এইসব নিয়ে মত্ত হয়ে পড়েন, মধ্যবয়সী সেই ডাক্তারটির নাম—পট্টনায়েক। বাঙলা বলেন খুব সুন্দর, কথার ধরনে বোঝাবারও উপায় নেই যে ইনি বাঙালী নন, দুর্গা পূজার সময় বাঙালীদের নাট্যাভিনয়ে পর্যন্ত অবতীর্ণ হয়েছেন মাঝে মাঝে। সবার বন্ধু এই ডাক্তার পট্টনায়েককে 'কল্' দিলো দিব্যেন্দু। টেলিফোন পাবার একটু পরেই চলে এলেন তিনি। ফর্সা রঙ, চক্চকে টাক, গোলগাল চেহারা, সাদা ট্রাউজারের উপরে ঘি-রঙের হাওয়াইয়ান সার্ট, কলরব করতে করতে

এসে বাড়ি ঢুকলেন ব্যাগ হাতে। বললেন—কই, মিস্টার, কোথায় মশাই, মিসেসকে খবর দিন, তাড়াতাড়ি এক কাপ চা। চিনি নয়, দুধ নয়, কয়েকটা লেবুর রস দিয়ে, লেমন-টি।

পার্থপ্রতিমকে দেখলেন তিনি যত্ন নিয়ে। থার্মোমিটার লাগালেন। দেখে বললেন, টেম্পারেচার একটু রয়েছে! জিভ দেখি? হাঁ করো ত বাবা, হাঁ করো? আ—আ?

জিভ, চোখের কোণ, সব দেখে, বুকেও স্টেথো বসালেন, বুক পিঠ দেখলেন ভালো করে। তারপরে এক সময় দেখাদেখি সব শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—কই স্যর, আমার লেমন-টি কই?

তারপরেই প্রতিমার দিকে তাকিয়ে,—জ্বর পাঁচ দিন হয়ে গেছে বললেন না? ঠিক আছে, কিছু ভাববেন না, আমি গিয়েই ওষুধ পাঠিয়ে দিচ্ছি। বুকে একটু সর্দি বসেছে, কিছু ভাববেন না।

চা পানের পর ওঁর ভিজিটটা দিয়ে ওঁকে যখন এগিয়ে দিচ্ছে দিব্যেন্দু, উনি বললেন—আজকাল নতুন নতুন সব ওষুধ বেরিয়েছে। অ্যান্টি-ফ্লোরেস্টিন আর আজকাল দেবার দরকার হয় না। তিন দিন ওআচ্‌ করি, তারপর দরকার হলে পেনিসিলিন ইন্‌জেকসন দেবো।

দিব্যেন্দু চমকে উঠলো, বললো—শক্ত কোনো অসুখ নয় ত, ডাক্তার?

হেসে বললেন—আরে না, না, একটু ব্রঙ্কাইকাল টেণ্ডেন্সি মনে হচ্ছে! ও কিছু নয়। আপনি আপনার বেয়ারাকে পাঠিয়ে দিন, প্রেস্‌ক্রিপশনটা হাতে দিয়ে দেবো।

—তা দিচ্ছি!

উনি গাড়িতে ওঠবার আগে বললেন—মিসেসকে ধন্যবাদ জানাবেন লেমন-টির জন্য। লেমন-টি আমার খুব ফেভারিট থিং।

ডাক্তার চলে গেলেন। ওর মনটা যে খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। প্রতিমা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে—কোনো শক্ত অসুখ নয় ত খোকনের?

—নাগো, না।

তারপর কেটে গেল প্রায় দিন দশেক। ঠিক সেই মুহূর্তে এত সব কাজ এসে গেছে হাতে যে, নিশ্বাস ফেলবার সময় রইল না। ছোট-খাট ট্যুরও করে ফেলে দিব্যেন্দু এর মধ্যে একটা। টেণ্ডার দিয়ে কাজ ধরে যাদের কনট্রাক্টরি করতে হয়, তারা বুঝবেন, এসব কাজের কী ঝামেলা, কি পরিশ্রম, কী উদ্বেগ হয়ে পড়ে এক এক সময়। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন ঐ টেণ্ডার দেবার কাল চলেছে। অবশ্য দিব্যেন্দু পরভৃতিক, ওর যারা মালিক তারা রয়েছে কলকাতায়, অন্যান্য বারে এসময় শ্রীপতি বাবু আসেন। এবার কাজের চাপেই বোধ হয় এলেন না। তবু প্রতি মুহূর্তে আশা করছে দিব্যেন্দু, এই বুঝি এসে পড়ল শ্রীপতি—এই বুঝি এসে পড়ল। কারণ, বেশ কিছুদিন ধরেই ত সে না জানিয়ে হঠাৎ আসতে আরম্ভ করেছে।

পার্থপ্রতিম আরও একটু রোগা হয়ে গেছে, এমনি যেমন খেলা করে বেড়ায়, তেমনি করে। শান্তপ্রকৃতির ছেলে, ওকে নিয়ে কারুর কোনো বিশেষ ঝামেলা পড়ে না। ইদানীং অসুখে পড়ে রাগটা একটু বেশী হয়ে পড়েছে, মনে না ধরলে হাতের জিনিস বা খেলনা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কান্না শুরু করে দেয়। প্রতিমা শুষ্ক মুখে বললে—জ্বর যে এখনো কমছে না! আগের মতো বেশী ওঠে না, তবে জ্বর থাকেই।

—ডাক্তার আসেনি?

—হ্যাঁ, দুদিন এসে গেছেন এর মধ্যে। একদিন ত তুমি ছিলেই? তোমার যাবার আগে।

ফোনে ডাকলো ডাক্তারকে। পট্টনায়ক বললেন—ওষুধ নতুন দিচ্ছি। ব্রঙ্কাইক্যাল টেণ্ডেন্সিটা কমে গেল, কিন্তু কেন যে জ্বরটা যাচ্ছে না, বুঝছি না। না-না, ভয় পাবার কিছু নেই।

তাই হলো, পরবর্তী দশ দিন, পালটানো ওষুধের ব্যবস্থায়

চলতে লাগল সব। পার্থপ্রতিম উঠে উঠে আর ত খেলা করে না, প্রায়ই সব সময় শুয়ে-শুয়ে থাকতে চায়। সকালের দিকে জ্বরটা কমে গেছে, একদিন না-তুদিন ছেড়েও গিয়েছিল বুঝি, কিন্তু, আসে আবার বিকেলের দিকে, তখন আর ও 'বাব্‌বা-মামা-বেই যাই' এসব বলতে পারে না, শুযে পড়ে। রাঁধুনী বিমলা এর মধ্যে কতো তাবিজ-কবচ যে এনে দিয়েছে যোগাড় করে, তার ইয়ত্তা নেই, সে-সবগুলিই বেঁধে দেওয়া হয়েছে শিশুর হাতে। এটা কী? জিজ্ঞাসা করলে পার্থ বলে—'তাইজা'। 'তাবিজ' কথাটার শিশু ভাষা।

সব শুদ্ধ নিয়ে কেটে গেল বিশদিনেরও বেশী, ডাক্তার পট্টনায়ক নিজেও হয়ে পড়লেন চিন্তিত। দিব্যেন্দুকে বললেন—শহর থেকে বড়ো ডাক্তার আনতে চাই। ধরতে পারছি না ত?

দিব্যেন্দুর সম্মতিতে তা-ই আনা হলো উচ্চ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। বিশ পঁচিশ মাইলের মধ্যেই ছিল ভারতের এক বিখ্যাত ডাক্তার, সেই শহরের কথাই বলেছিলেন আর কী। শহরের সঙ্গে দিব্যেন্দুরও ছিল নিবিড় পরিচয়, কারণ, কর্মসূত্রে এখানে প্রায়ই আসতে হতো তাকে। এবং ঘটনাচক্রে দেখা গেল, উক্ত বড়ো ডাক্তারও দিব্যেন্দুর পরিচিত, ও অঞ্চলের ফরেস্ট অফিসার যিনি ছিলেন তারই ইনি ভাই—ডাক্তাব সিনা। ডাক্তার সিনার সঙ্গে ফরেস্ট অফিসারের বাড়িতেই আলাপ হয়েছিল দিব্যেন্দুর।

ডাক্তার সিনা নানান ভাবে পরীক্ষা করলেন শিশুকে। তারপরে একসময় বললেন—আচ্ছা, একে কে-কে রাখে, অর্থাৎ কে-কে নিয়ে বেড়ায়। আপনারা স্বামী স্ত্রী ছাড়া? ডাকুন ত তাদের?

রাঁধুনী বিমলা এলো। গৃহভৃত্য কিষণ এলো। অফিসের বেয়ারাও নিতো মাঝে মাঝে, তাকেও ডাকা হলো। সবাইকে দেখে নিয়ে কিষণকে আগেই ছেড়ে দিলে ডাক্তার, ছেড়ে দিলেন বেয়ারাকে। তারপরে পড়লেন বিমলাকে নিয়ে। ডাক্তার সিনা

স্থানীয় ভাষা ভালোই জানতেন, সেই ভাষায় নানান প্রশ্ন তিনি করতে লাগলেন বিমলাকে। এবং যখন তিনি এসেছিলেন সময়টা ছিল সকালবেলা, ডাক্তার পট্‌নায়েককে ডেকে বললেন—বিকাল-বেলা আপনি আসবেন ত? ওয়াচ হার।

তারপরে, বিমলা চলে যেতে, দিব্যেন্দুর দিকে ফিরে বললেন—আপনার এখন কাজ আছে?

—তা আছে।

বললেন—লিভ্ ইট্ টু সামবডি এল্‌স্। আপনি আমার সঙ্গে—আমার গাড়িতেই চলুন—বাচ্চাকে নিয়ে। ডাক্তার পট্‌নায়েকও থাকবেন সঙ্গে। ম্যাটার ইজ ভেরী ইম্পর্টাণ্ট।

অফিসে তখন সত্যি খুব জরুরী কাজ ছিল। অথচ দিব্যেন্দুর মনের অবস্থা যে কী হতে পরে তা ত সহজেই অনুমান করা যায়। সেই যে বহিরাগত সব ক্রেতা এসে পড়েন মাঝে মাঝে সেই সব ক্রেতার ভীড় লেগেছে ঠিক এই সময়। ওদের বিল করা, টাকা আদায় করা—কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যে এসব কাজ না সারা হলে মুশকিল ব্যাপার। দিব্যেন্দু অফিসঘরে গিয়ে চৌধুরীর ওপর সব ভার দিয়ে, তাকে সব বুঝিয়ে টুঝিয়ে দিয়ে চলে এলো। চৌধুরী কতগুলি বিল ফর্ম বার করে দিয়ে বললে—সই করে দিয়ে যান। ওঘরে ডাক্তার বসে আছে, দিব্যেন্দুর আর দেরী করার সময় নেই, তাড়াতাড়ি কিছু টাকা পকেটে পুরে নিয়ে তাড়াতাড়ি তার বসবার ঘরে চলে এলো সে। এসে দেখে, শাড়ি বদলে শিশুকে কোলে নিয়ে প্রতিমাও তৈরী। দিব্যেন্দু একটু অবাক হয়ে বললে—এ কী, তুমিও যাবে নাকি?

ডাক্তার সিনা বললেন—হ্যাঁ, ওঁর যাবার দরকার। আপনার রাঁধুনীটিকেও নিয়ে যেতাম, কিন্তু সবাই বেরিয়ে গেলে গৃহকর্মে অসুবিধা হতে পারে। ওকে ডাক্তার পট্‌নায়েক নিয়ে যাবেন কাল। নিন, চলুন।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই শহরে ডাক্তার সিনার চেম্বারে এসে গেল সবাই। বাইরে প্রচুর রোগী অপেক্ষা করছেন, তাঁদের দিকে মনযোগ না দিয়ে এঁদেরই নিয়ে পড়লেন তিনি প্রথমে। ডাঃ পট্‌নায়েককে ডেকে কী যেন বললেন। পট্‌নায়েক ডাক্তার সিনার গাড়িতেই দিব্যেন্দুদের নিয়ে আরেকটা জায়গায় এলো। এক্স-রে করার ক্লিনিক। লাল অক্ষরে বড়ো-বড়ো করে লেখা আছে কথাগুলি। দেখে, বুকের ভিতরটা হঠাৎই ছ্যাঁৎ করে উঠল দিব্যেন্দুর।

ডাঃ পট্‌নায়েক বললে—বাচ্চার বুকের একটা এক্স-রে নেবো। বুঝলেন না? সাবধানের মার নেই। নেওয়া হলো। এবং আশ্চর্যের কথা, শুধ্ বাচ্চাটির নয়, তাদের স্বামী-স্ত্রী দুজনেরও নেওয়া হলো। পট্‌নায়েক বললেন—ডাক্তার সিনার নির্দেশ।

এরপরে, ডাক্তার সিনার সঙ্গে দেখা করে, ওরা যখন তাঁর নির্দেশে তাঁরই গাড়িতে ফিরে আসছে, সিনা বললেন—কাল সকালে একটা ট্রাঙ্ক কল করব আপনাকে। ভাববেন না।

কিন্তু যতটা সহজ ও সোজা ভাবা গিয়েছিল, ততটা সহজ ও সরল নয় ব্যাপারটা। ডাঃ পট্‌নায়েক করলেন ওকে টেলিফোন—ডাঃ সিনা বললেন, এইমাত্র এক্স-রে'র রিপোর্ট পেলাম। আপনার বা আপনার স্ত্রীর কোনো বোগ নেই। কিন্তু, কার এ রোগ? কার সোহাগ অমন করে বিপদ ডেকে এনে এক নিষ্পাপ শিশুর সর্বনাশ করতে বসেছে? আপনি এখুনি বিমলাকে আমার চেম্বারে পাঠিয়ে দিন। আমার কম্পাউণ্ডার শহরে যাচ্ছে, ওর সঙ্গে তাকে এখ্‌খুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি ক্লিনিকে। ডাক্তার সিনার মতো আমিও সন্দেহ করতে শুরু করেছি তাকে।

কম্পিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল দিব্যেন্দু—অসুখটা তাহলে— ?

—টিউবারকুলার ইন্‌ফেকশন। এক্স-রে'র রেজাল্ট খুব খারাপ। মিলিনিয়রী টিউবারকুলার জার্ম ছড়িয়ে গেছে দুটো লাঙ্গ্‌সেই।

বাচ্চা ছেলে, গ্যালপিং না হয়ে দাঁড়ায়। এ ছাড়া, আপনারাও সাবধান থাকবেন।

—চিকিৎসা?

ডাক্তার পট্‌নায়েক বললেন—বিমলাকে পাঠাবার বন্দোবস্ত করেই আমি যাচ্ছি। রোগ যখন ধরা পড়েছে, চিকিৎসার কোন ত্রুটি হবে না।

চলল চিকিৎসা। প্রতিমা যখন সব শুনল, তখন তার মুখ দিয়ে একটি মাত্র মর্মভেদী শব্দ বেবোলো—ওঃ! মাগো!

রইল পড়ে দিব্যেন্দুর অফিস। চৌধুরীর হাতে অফিসের সব ভার ছেড়ে দিয়ে, সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শিশুটিকে নিয়ে। দেখা গেল, ডাক্তার সিনার সন্দেহ অমূলক নয়। বিমলা রোগগ্রস্ত। এবং তার থেকেই শিশুতে সংক্রমিত হয়েছে এই বোগ। তারে চিকিৎসার ব্যবস্থা পট্‌নায়েকেই করে দিলেন শহরের এক হেল্‌থ্‌ সেণ্টারেব টি-বি ক্লিনিকে। বিমলাব কে এক আত্মীয় আছে শহরে, চলে গেল সে তাব কাছে। পট্‌নায়েক বললে—খুব বেঁচে গেছেন যে আপনাদেব কিছু হয় নি। ওব স্পুটাম পবীক্ষা করে দেখা গেল—অন দি ভার্জ অব এ কেস—হুইচ ইজ পজিটিভ। ও ঠিক সেরে উঠবে, কিন্তু, শিশুটিকে নিয়েই বিপদ।

একদিন-আধদিন নয়, এব পরও প্রায় দিন পনেরো-ষোল রোগের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলল পার্থ। ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, তেমন ডাকতে পারে না। কিন্তু জ্বল-জ্বল-করা বড়ো বড়ো চোখ দুটি সর্বক্ষণ খুঁজে বেড়ায় তাব বাপ আর মাকে। দেখতে পেলে খুশি হয়, ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে ওঠে, বলে—'বাব্‌বা, বেই-বেই' 'মা যাই'।

কিন্তু, কে পূরণ কববে শিশুব আকাঙ্ক্ষা। বাবার সঙ্গে বেড়ানোও তাব হয় না, মাব কোলেও তার যাওয়া হয় না। একভাবে সে শুয়ে থাকে বিছানায়। ডাক্তাবের নির্দেশ। চারিদিকে ডেটলের গন্ধ, বাড়িটাকে যেন সত্যিই হাসপাতালের ভূতে পেয়েছে।

রাখা গেল না। নাক-মুখ দিয়ে ঝলকে-ঝলকে বেরুতে লাগল রক্ত, ডান পা-টা পড়ে গেল, তারপরে ডান হাতটাও স্থির হয়ে গেল, এবং এক সময় স্থির হয়ে গেল সর্বাঙ্গ। যখন সব স্থির, তখন মনে হলো দিব্যেন্দুর, যে নিদারুণ কষ্ট পাচ্ছিল ঐটুকু শিশু, তার থেকে ও যেন বেঁচে গেছে! এ মৃত্যু নয়, এ বেঁচে যাওয়া!

কিন্তু প্রতিমা? যখন শিশুটিকে তার কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাওয়া হলো তার অন্তিম যাত্রায়, তখন সে কেঁদে কেঁদে একেবারে প্রতিমার মতোই স্থির হয়ে গেছে!

শিশু চলে যাওয়ার পর, তার ব্যবহৃত কাপড় চোপড়, এমন কি খাট পর্যন্ত বাইরে এনে পুড়িয়ে ফেলল কিষণ আর বেয়ারা। নতুন একটা রাঁধুনী পাঠিয়েছে পট্টনায়েক নিজে। সে-ও যোগ দিয়েছে ঐ অগ্নিদাহে। সেই লেলিহ অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রতিমা এক সময় বাক্স খুলল, পার্থর যে-সব পোশাকী ভালো জামাকাপড় ছিল, সেগুলিকে সমর্পণ করলে সেই অগ্নিকুণ্ডে।

এর পরে কেটে গেছে দীর্ঘ নব্বইটি দিন—তিনটি মাস। সব যেন শূন্য, কোনো কাজে মন বসে না দিব্যেন্দুর, অফিসে গিয়ে সে বসে, কিন্তু কাজে মন নিবিষ্ট করতে পারে না, হিসেবে ভুল হয়ে যায়। খাতাপত্র চৌধুরীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—যা হয় করুন, আমি আর পারি না।

শ্রীপতিকে চিঠি লেখে দিব্যেন্দু। লেখে—ছুটি দাও দিন কতকের জন্য অন্ততঃ। আর পারি না।

শ্রীপতি উত্তরে দেয় গীতার উপদেশ—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহারয়—

কিন্তু কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে দাঁড়িয়ে এ উপদেশ যে শোনবার যোগ্যতা অর্জন করেছিল, তার নাম—অর্জুন। পার্থপ্রতিম তার নাম। পার্থ—

একা বসে থাকতে থাকতে ছেলেমানুষের মতো হঠাৎ ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে দিব্যেন্দু। তার কানে বারবার এসে বাজতে থাকে সেই অশ্রুতপূর্ণ শিশু-স্বর—'বাব্‌বা' 'বেই-বেই'!

—পারছি না আমি, আর পারছি না কাজ করতে।

এমন দিনে হঠাৎ একটা চিঠি এলো অশোকার। কাশী থেকে। লিখেছে—'বাবার কাছ থেকে সব শুনলাম। তখন আমার মন কেঁদে উঠেছিল বলেই আমি জানতাম তোমার একটা কিছু ঘটবে। তবে এতো বড় সর্বনাশ যে ঘটবে, তা ভাবতে পারি নি। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাই। কিন্তু হায় রে, পায়ে আমার শিকল পড়ে গেছে। চিঠির ওপরে কাশীধাম দেখেই বুঝতে পারছ কোথায় আছি? ঠিকানা দিলাম না, পাছে মনের ঐ অবস্থায় তুমি চিঠি লিখে বসো আর তার ফলে আমার শ্বশুর শাশুড়ীর গৃহে পাছে কোনো আপত্তি হয়। অবশ্য আমার বাবা জানেন আমার ঠিকানা। ঠিকানা তুমি চাইলে যে না পাবে এমন নয়। কিন্তু চিঠিপত্রের কথাটা বড়ো নয়, আমার মন চাইছে এই মুহূর্তে ছুটে তোমাদের কাছে যেতে। জানি না প্রতিমা নিজেকে বাঁধতে পেরেছে কী শক্তিতে। আমি যদি পারি তো যাবো শ্রাদ্ধ-শান্তিটা চুকে গেলে। এ অবস্থায় চট্‌ করে রওনা হওয়াও যে অসম্ভব!'

শেষের দিকটা ঠিক বুঝল না দিব্যেন্দু। শ্রাদ্ধ-শান্তি? কা'র শ্রাদ্ধ-শান্তি? তাড়াতাড়ি ফোনটা তুলে নিয়ে পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করল দিব্যেন্দু। তিনি সব শুনলেন, বললেন—হ্যাঁ, তোমার ঐ সব গেল, তোমায় আর জানাই নি, আমার মেয়ে বিধবা হয়েছে।

—সে কী?

ফোনের অপর প্রান্ত থেকে উত্তর এলো—গুপ্তে মারা গেছে একটা অ্যাক্‌সিডেণ্টে। বম্বেতে, রান-ওভার হয়ে। পেটের ওপর দিয়ে গাড়ি চলে গেছে। একেবারে সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। গুপ্তের সঙ্গে তার এক ভাই ছিল, ভাইয়ের বউ ছিল, এক ভাইপো ছিল।

তাদের লেখা বর্ণনা থেকে যা পাওয়া গেছে আর কী! চমৎকার স্বাস্থ্যবান ছেলে—এ-কী দুর্দৈব দেখ! শুনলাম, কিশোর ভাইপোকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনান্ত হয়েছে। যিনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন, বম্বের তিনি নাম-করা লোক, বম্বের সিনেমা-কাগজগুলিতে প্রায়ই তার নাম বেরোয়। যাই হোক, মেয়ে হয় ত কিছু টাকা পাবে, কিন্তু যাকে সে হারিয়েছে, তাকে আর ফিরে পাবে কী করে বলো?

ফোন্‌টা রেখে দিয়ে, চুপচাপ স্থাণুর মতো বসে রইল কিছুক্ষণ দিব্যেন্দু। তারপর এক সময় উঠে চলে গেল প্রতিমার কাছে। নতুন রাঁধুনাটির ওপরে সংসারের প্রায় সব-কিছু ছেড়ে দিলেও, কিছু কিছু কাজ সে নিজেও সেরে নেয়। কথাটা তাকে 'বলব-কি-বলব-না' করেও শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল দিব্যেন্দু।

উত্তরে প্রতিমা ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে রইল তার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে। তার পরে তার চোখ দুটি হয়ে উঠল ধীরে ধীরে সজল, কোনক্রমে বলে উঠল—আমাকে নিয়ে চলো অশোকাদির কাছে।

কথাটা মন্দ বলেনি প্রতিমা! দিন কতক ছুটি নিয়ে কোথাও গেলে কেমন হয়, এ কথাটা কিছুদিন ধরেই ভাবছিল দিব্যেন্দু। এখন মনে হলো, কাশী গেলেই বা মন্দ কী? কাশীতে ওর মায়ের এক মাসীমা থাকেন, সন্ন্যাসিনী তিনি। তাঁর কথা মার কাছ থেকে বহুবার শুনেছে দিব্যেন্দু। মার ঠিক ঐ এক কথা! বাবার সঙ্গে ঝগড়া করল, বা তাঁর সঙ্গে একটু মন-কষাকষি হয়েছে—অমনি মায়ের ঐ এক উক্তি,—আমি কাশী যাবো।

—একা?

—একাই।

—কোথায় থাকবে?

মা একটুক্ষণ থেমে, তারপরে স্মরণ করবার চেষ্টা করতে করতে বলতেন,—গণেশ মহল্লা ; মাসিমার কাছে। কুট্টি মাসিমা।

দিব্যেন্দু সেই প্রায়-বাল্যকাল থেকে ঐ কথাটা শুনে আসছে,—কুট্টি মাসিমা! কুট্টি শব্দটা সঙ্গে না থাকলে তার কানে কথাটা অমন লেগে থাকতো না।

প্রতিমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মা-র সেই বহুল প্রচারিত কুট্টি মাসিমার কথা মনে পড়ে গেল দিব্যেন্দুর। ভাবল, অতর্কিতে সেই সন্ন্যাসিনীর আশ্রমে গিয়ে উঠলে কেমন হয়? তারপরে রইলেন পঞ্চাননবাবু, তাঁর কাছ থেকে অশোকার ঠিকানা নিয়ে তাকে খুঁজে বার করতে আর কতক্ষণ?

কিন্তু, সে ছুটির আবেদন পত্র পাঠাবে, সেটা মঞ্জুর হবে, তাকে রেহাই দিতে আসবে কৈলাস বাবুর মতো কোন লোক, আর ততদিনে, হয়ত শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাবে, অশোকা চলে আসবে এখানে, তার বাপের কাছে।

এই সব চিন্তাগুলি মস্তিষ্কের কোষে কোষে গুঞ্জন তুলে দিয়েছে, ছুটির আবেদন পাঠাবে কি পাঠাবে না করতে করতে একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হলো তার মা আর ভাই।

মা কেঁদে এসে জড়িয়ে ধরলেন তার বৌকে, কিন্তু মা-র দিকে তাকিয়ে দিব্যেন্দুর চোখে আর পলক পড়তে চায় না! এ কী চেহারা হয়ে গেছে তার মায়ের! একটা কঙ্কালকে চর্ম পরিধান করালে যা হয়, তাই।

ভাই বললে—তোমাকে জানাই নি দাদা, তোমার ঐ টেলিগ্রাম গিয়ে পৌঁছনো মাত্র একবার 'খোকনমণি' বলে চিৎকার করে উঠল মা, তার পরেই পড়ল—অসুখে। কঠিন অসুখ। নিউমোনিয়ার মতোই বলতে পারো। ডাক্তার বললে—খুব খারাপ ধরনের নিউমোনিয়া নয় অবশ্য, নইলে, এ বয়সে নিউমোনিয়া মারাত্মক!

ব'লে একটু থেমে থেকে, ভাই বললে—তাছাড়া, মাথারও একটু

গোলমাল হয়েছে। সুনন্দাকে পর্যন্ত যা নয় তাই বলে গালাগালি দিয়ে ওঠে! মেজাজটাই গেছে বিগড়ে!

অবাক হয়ে সব শুনে যাচ্ছে দিব্যেন্দু। একবার মনে হলো খোকা চলে গিয়ে তার দুর্ভাগ্যেরই বুঝি সূচনা করে দিয়ে গেছে, কোথায় যে এর শেষ হবে কে জানে!

ভাই বললে—তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে দাদা। ওঘরে এসো!

দিব্যেন্দু গেল পাশের ঘরে। ভাই বললে—শ্রীপতির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমাকে নানা রকম বললে। বললে—দিব্যেন্দু আমাদের বহু টাকা সরিয়েছে। আমি শীগগিরিই যাচ্ছি, গিয়ে এর কিনারা করছি।

কথাটায় এত চমকে উঠল দিব্যেন্দু যে বলার নয়। একবার মনে হলো, তার শরীরের মধ্য দিয়ে একটা হিম স্রোত বয়ে গেল বুঝি! আরেকবার মনে হলো তার হৃৎপিণ্ডের গতিটাই বুঝি স্তব্ধ হয়ে যাবে চিরতরে!

ভাই উদ্বিগ্নকণ্ঠে প্রশ্ন করলো—কী হলো, দাদা?

—কিছু না।

ভাই বললে—আমাকে বলো দাদা, কথাটা কি সত্যি?

দিব্যেন্দু বললে—সবৈব মিথ্যা।

ভাই বললে—যাক বাবা, বাঁচলাম শুনে, সেই থেকে এমন ভাবনা হয়েছিল!

দিব্যেন্দু ততক্ষণে একটু সামলে নিয়েছে, বললে—মা-র চিকিৎসা করা দরকার।

—এখানে?

—দেখা যাক।

অফিস-ঘরে এসে চুপচাপ ব্যাপারটা ভাবতে বসল দিব্যেন্দু। বহু টাকা সরিয়েছে দিব্যেন্দু—বহু টাকা সরিয়েছে!—কথাটা বারবার

কানের কাছে বাজতে লাগল গ্রামোফোনে বসানো একঘেয়ে একটা রেকর্ডের মতো।

অবাক হয়ে ভাবতে লাগল দিব্যেন্দু, এ-কথার অর্থ কী? ক্যাশ-বইটা বার করে হিসেবগুলি আরেকবার দেখতে লাগল দিব্যেন্দু। যেখানে-যেখানে যে-ভাবে টাকার হিসেব আছে, সে-সমস্ত যায়গাতেই চোখ বুলিয়ে নিলো সে, কিন্তু কোথাও কোনো অসঙ্গতি বা ফাঁকি দেখতে পেলো না।

বহুদিন পরে অবশ্য মন দিয়ে অফিসের খাতাপত্র দেখতে বসেছে দিব্যেন্দু, দেখতে-দেখতে মাথাটা কেমন ঘুরে গেল একসময়। মনে হলো, প্রখর রৌদ্র সামনে থেকে হঠাৎ দপ্ করে নিভে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসছে!

চেয়ারে মাথাটা হেলিয়ে, চোখ বুজে বেশ কিছুক্ষণ পড়ে রইল দিব্যেন্দু। ধীরে ধীরে আবার সব ঠিক হয়ে গেল, সেই মধ্যাহ্নের রৌদ্র, সেই অফিস, সেই চেয়ার। ঘরে তখন কেউ ছিল না তাই রক্ষে, নইলে, তাকে ঐ অবস্থায় দেখলে হৈ-হৈ বাঁধিয়ে দিতো সবাই!

সেদিনটা আর হলো না, পরদিন ফোন করে ডাক্তার পট্নায়েককে ডেকে পাঠালো দিব্যেন্দু। ফোনের অপর প্রান্ত থেকেই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ডাক্তার—আবার কী হলো দিব্যেন্দুবাবু?

দিব্যেন্দু উত্তর দিলো—আমার মা এসেছেন, নিউমোনিয়া হয়ে মাথার একটু গোলমাল দেখছি, শরীরও ভেঙে পড়েছে। এসে দেখে যান।

যথারীতি এলেন ডাক্তারবাবু। যেমন হৈ-হৈ করতে করতে ঢোকেন, তেমনি এলেন, বললেন—মিসেস কই? লেমন-টি করতে বলুন।

চায়ের বন্দোবস্ত করতে বলে মাকে সামনে নিয়ে এলো ডাক্তারের। ডাক্তার প্রাথমিক পরীক্ষাদির পরে বললেন—টনিক খেতে হবে। আর চাই কম্প্লিট্ রেস্ট। কিছুদিন চুপচাপ শুয়ে থাকুন, বুঝলেন মা? কাজকর্ম করবেন না।

মা বললে—তাই কি পারি নাকি? বৌমা সবে অমন শোক পেয়েছে—

বলতে বলতে মা-র চোখদুটো জলে ভরে উঠল, বললে—আমার নাতিকে রাখতে পারলেন না আপনারা!

বলেই, কান্নায় আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মা।

ডাক্তার পট্‌নায়েকের অধীনে ঠিকমতো চিকিৎসা হলে, মা ঠিক সেরে যেতো বলে মনে হয়। কিন্তু, কে শুনবে সে কথা?

ডাক্তার চলে যাবার পর থেকেই শুরু হলো মা-র চিত্ত-বৈলক্ষণ্য! প্রথমে বললে—ছুঁচ-টুঁচ ফোটাবে না ত?

—না না।

—বলা যায় না, যদি বিষ দিয়ে দেয়।

ভাই ছিল কাছে, সে উঠলো হো-হো করে হেসে। বললে—দূর, তা-ও কি হয়?

কিন্তু, ঠিক দুদিন পরেই ঘটল আশ্চর্য ঘটনা। ভাই আজ চলে যাবে স্থির ছিল। দিব্যেন্দুর মা হঠাৎ ধরে বসলেন, তিনিও যাবেন। সবাই কত অনুরোধ করলেন, কিছুতেই উনি শুনলেন না। একবার শুধু বললেন—এখানে থাকব কোথায়? পাথরের বাড়িতে আমি থাকব না, আমার চাই ইটের বাড়ি।

ভাই আর দিব্যেন্দু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। ভাই মাকে বললে—ইটের বাড়ি হয়ে যাবেখন।

—ছাই হবে!—মার চোখ দুটি হঠাৎ জ্বলে উঠল—আমার বিয়ে হবার পর থেকেই ত শুনে আসছি, বাড়ি হবে বাড়ি হবে—হলো কই? কে দিলো করে?

দিব্যেন্দু মাথা নীচু করে চুপ করে রইল। ভাই বললে—দেবেখন। দাদাই করে দেবে। তুমি থেকে যাও।

—না! মা আবার বললে—এখানে থেকে খোকনমণির মতো আমিও মরে যাবো।

বলেই, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠে দিব্যেন্দুর ভাইকে বললে--তুই আমাকে আজই, এখুনি, নিয়ে যাবি কিনা বল ?

কোন অনুনয়-বিনয়েই কাজ হলো না, চলে গেলেন দিব্যেন্দুর মা।

আর, তারপর থেকে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে দিব্যেন্দু। এক সময় প্রতিমাকে গিয়ে বললে—তোমার সঙ্গে কোন কথা কাটাকাটি হয়েছিল মা-র ?

প্রতিমার চোখে জল এসে গেল, সে বললে—বিশ্বাস করো, আমি কিছুই বলিনি। মা হঠাৎ বললেন—একটা সত্যি কথা বলো ত ? খোকনকে তুমি বিষ দিয়েছিলে ? আমি ত অবাক ! মা হয়ে আমি বিষ দেবো ছেলেব মুখে তুলে ? উনি বললেন—তুমি যে কতো বড়ো সবনাশী, তা আমি আগে থাকতেই জানতাম !

বলতে বলতে দিব্যেন্দুর সামনে আবার ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল প্রতিমা। ওকে কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে গিয়েও দিব্যেন্দুর মনে হলো,—আহা, একটু কাঁদুক। ছেলে চলে যাবার পর থেকে, ও যেন কেমন স্তম্ভিত পাষাণ-মূর্তি হয়ে গেছে ! কেঁদে কেঁদে লাঘব হয়ে যাক ওর মনের ভার !

এব পরের ঘটনা একটু সংক্ষিপ্ত। হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হলেন শ্রীপতিবাবু। সঙ্গে অন্য একটি লোক, ওর কী সম্পর্কের সম্বন্ধী হয় যেন। তাকে জানায়নি শ্রীপতি, কিন্তু গোপনে চৌধুরীকে জানিয়েছিলেন। তাই চৌধুরী গিয়েছিল স্টেশনে। যখন ট্যাক্সী এসে দাঁড়ালো গেটের সামনে, দেখা গেল, গাড়িতে বসে আছেন ওরা তিনজন। নূতন মানুষটির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন শ্রীপতিবাবু।

এক সময় দিব্যেন্দু শ্রীপতিবাবুকে বললে—ভালই হলো, উনি

এলেন। আমাকে মাস খানেকের ছুটি দাও, কাশীতে গিয়ে থেকে আসি।

শ্রীপতি দিলেন সংক্ষিপ্ত উত্তর—হবেখন।

পরদিনই অফিসে বসল তাদের চারজনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন। তারা দুজন আর বিনয়বাবু ও চৌধুরী। শ্রীপতি-বাবু দিব্যেন্দুকে অপমান করলেন যা-তা ভাষায়। তাঁর অভিযোগ, চার হাজার টাকা সরিয়েছে দিব্যেন্দু।

প্রথমটায় বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল দিব্যেন্দু, তার মুখে আর কথা সরেনি। শ্রীপতিব মুখে শোনা সব ভালো-ভালো অন্তরঙ্গ সুরের কথাগুলি হঠাৎ একসঙ্গে বেজে উঠতে লাগল তার মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে!

সে বললে—সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা!

গর্জে উঠলেন শ্রীপতি—মিথ্যা কথা? প্রমাণ আমার কাছে আছে। এই দেখ।

বলে, গোটা চারেক বিল তার চোখের সামনে রাখলেন শ্রীপতি। বললেন—এই বিলগুলির পরিমাণ প্রতিটি হাজার টাকা করে সবশুদ্ধ চার হাজার টাকা। কোম্পানির ফর্মে বিলগুলি করা হয়েছে, অথচ, খাতায় এনট্রি হয়নি কেন? এ বিলগুলি যে করা হয়েছে, তার হিসেব কই? এ বিলগুলি রিএলাইজ করা হয়েছে অবশ্যই, কিন্তু তার টাকাগুলি গেল কোথায়? ক্যাশবুকেও এনট্রি করা নেই, কোথাও এনট্রি করা নেই।

আজও ভাবতে অবাক লাগে, ঐ মুহূর্তে কেমন স্থির চিত্তে তার করনীয় আচরণগুলি ক'রে গিয়েছিল দিব্যেন্দু! কোথা থেকে, কোন স্বর্গ থেকে নেমে এলো সেই মুহূর্তে এক শুভ আশীর্বাদ, তা না হলে, ঠিক সেই সময়, বিলগুলি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে, হঠাৎ তার মনে অমন করে প্রোজ্জ্বল সত্যের উদয় হয়ে উঠবে কেন?

ঐ যে আগে বলা হয়েছে, কতগুলি বাইরের পার্টি এসে শহরে উপস্থিত হয়, যাদের বলা হয় 'ফ্লোটিং পার্টি',—যারা সকালে এসে সওদা শেষ করে বিকেলে চলে যায়,—সেই সব পার্টিকেই করা সব বিল্। এসব বিলের পেমেণ্ট হয নগদ টাকায়, সুতরাং ইচ্ছা করলে এ-সব টাকা সত্যই অপহরণ করা যায়। তবে কথা হচ্ছে, এই সব পার্টি ত কোম্পানির বাঁধা-ধরা পার্টি নয়, এসব টাকাগুলি হচ্ছে কোম্পানির একেবারেই বাড়তি আয়।

দিব্যেন্দু লক্ষ্য করল, বিলের নীচে তার সই জ্বল জ্বল করছে বটে, কিন্তু, যে তারিখে বিলগুলি করা হয়েছে, তার প্রথম দুটির তারিখ হচ্ছে, যখন সে তার বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে কলকাতায় গিয়েছিল, তখনকার।

সে তাড়াতাড়ি কয়েকটা ফাইল আর ক্যাশবই-টই দেখতে লাগল। দেখে, যখন স্থির নিশ্চয় হলো, তখন সেগুলি সে এগিয়ে দিল শ্রীপতির দিকে। বললে—দেখ।

—কী ?

—যে তারিখের বিল, সে তারিখে আমি কলকাতায়! এই দেখ, আমার কলকাতা রওনা হবার তাবিখ, আর এই দেখ তোমার বিলের তারিখ। কৈলাসবাবু তখনো এসে পৌছোননি।

শ্রীপতি সব দেখে শুনে, তারপর বললে—এটা কী করে হলো ?

দিব্যেন্দু অন্য দুটি বিলে তারিখও দেখল। ঠিক যেদিন তার ছেলে মারা যায়, সেই তারিখের দুটি বিল্। তার মনের অবস্থা এমন হয়ে পড়েছিল, যাতে কবে সে আর কাজ করতে পারেনি, চৌধুরীকে বলেছিল—আপনিই সব দেখুন।

ঘরের কোণে একটা স্তম্ভিত অন্ধকার-পুঞ্জের মতো বসেছিল চৌধুরী। ঘৃণায় সেদিকে দৃষ্টিপাত করল না দিব্যেন্দু। শ্রীপতিকে বাকী দুটো বিলের তারিখের কথা শুনিয়ে দিয়ে শুধু বললে—একটা কথা বলব শ্রীপতি। চার হাজার টাকা যখন বিলের পরিমাণ, তখন

ঐ পুরো টাকাটা কেউ নিশ্চয়ই আত্মসাৎ করতে পারে না। এর থেকে যে লভ্যাংশটা আসে সেটাই সে আত্মসাৎ করতে পারে। খুব বেশী হলে, পাঁচশো টাকা।

—ঈস্।—শ্রীপতি বলে উঠল—কম্‌সে-কম দেড় হাজার টাকা। এ বিজনেস আর আমায় শিখিও না।

দিব্যেন্দু বললে—তা হলে আমার বিরুদ্ধে যখন মামলা করবে বলছ, তখন, কোর্টে দাঁড়িয়ে ঐ কথাই বলো? চার হাজারে যদি দেড় হাজার টাকা লাভ থাকে এ ব্যবসায়ে, তাহলে প্রতি বছর ইনকাম ট্যাক্সে সাড়ে বারো পার্সেন্ট লাভ দেখাও কি করে? তাহলে নিশ্চয়ই ফাঁকী দাও ইন্‌কাম ট্যাক্স অন্য নানাভাবে খরচা দেখিয়ে! এবং কী-ভাবে সে সব খরচা দেখাও, তা আমার থেকে বেশী আর কে জানে?

শ্রীপতিবাবুর মুখখানা যেন মুহূর্তে বিবর্ণ হয়ে গেল। চৌধুরীর মাথাটা বুকের ওপর এতটা ঝুঁকে পড়ল যে, ওর মুখ আব দেখাই যাচ্ছে না। বিনয়বাবু একটু নড়ে চড়ে বসে বলে উঠলেন—আপনি কি ভয় দেখাচ্ছেন নাকি, দিব্যেন্দুবাবু?

দিব্যেন্দু তার দিকে তাকালো। মনে হলো, একবার বলে, বাঃ! খোসামোদটা বেশ বপ্ত করেছেন ত! কিছু না জেনে না শুনে দিব্যি মালিক পক্ষের হয়ে টেনে কথা কইতে শিখেছেন যে!

কিন্তু ঘৃণায় আর কথা বলতে পারছে না দিব্যেন্দু। শ্রীপতিবাবুই বললেন—মানুষের প্রত্যেক কাজেরই একটা জাস্টিফিকেশন থাকে, কিন্তু সেটা সবার কাছে সব সময় বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না।

সোজা হয়ে বসল দিব্যেন্দু, বললে—দেখ শ্রীপতি, তোমাকে যে বোকা ভাবব, এত বোকা আমি নই। সব জিনিসটাই তুমি বুঝতে পেরেছ। বুঝেও না-বোঝার ভান করছ। আমার ত্রুটি অবিশ্যি হয়েছে, ফাঁকা বিল-ফর্মে সই করে চৌধুরীর হাতে দেওয়া ঠিক হয়নি। তবু যে মাত্র চারটি বিলের ওপর দিয়ে গেছে, এই

রক্ষে। আরও কী না হতে পারত। আমি শুধু তোমাকে একটি কথা বলব, যদি ঐ চারটি বিল থেকে কম্‌সেকম দেড় হাজার ঠিকই এসে থাকে, ত তার কতো অংশ তোমার নিজস্ব পকেটে গিয়ে ঢুকবার জন্য বসেছিল ভাই? প্রথম থেকেই কি তুমি চৌধুরীকে আস্কারা দাওনি?

এই সময় চৌধুরী কি যেন মিন মিন মিন করে বলতে গেল, তার দিকে তাকিয়ে দিব্যেন্দু তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল—You shut up।

তারপরে শ্রীপতির দিকে ফিরে বলতে লাগল—তোমার অন্য পার্টনারদের ঠকাতে চাও, ঠকাও। আমি নিমিত্তের ভাগী হতে যাই কেন? যা তুমি চাইছ, তা-ই হোক, এই মুহূর্তেই আমি রেজিগ্‌নেশন দিচ্ছি।

তার পাওনা দুটি মাসের মাইনে দেয়নি শ্রীপতি, দিব্যেন্দুর হাতে একটিও পয়সা ছিল না। অবিলম্বে চলে আসতে হবে, অথচ কিভাবে সে আসে? অশোকার কথা ভয়ানক মনে পড়ছিল তার ঐ সময়। প্রতিমার গয়না বিক্রী করে, সেই টাকায় টুকি-টাকী ঋণ শোধ করে যেদিন সে চলে আসে, তার আগের দিন দেখা করতে গিয়েছিল সে পঞ্চাননবাবুর কাছে। সব শুনে তিনি বলেছিলেন—তুমি বেঁচে গেলে। আমার এখানে চলে এসো। কাজে যোগ দাও।

চুপ করে ছিল দিব্যেন্দু। সমস্ত ব্যবসায়িক জগতটার ওপর তার এমন ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল যে, সে ও কাজ গ্রহণ করতে পারল না। বরং একা-একা বসে বসে সে মনে মনে এক ছবির পরিকল্পনা করতে লাগল। এক হিংস্র নগ্নকায় আদিবাসী মানুষ অরণ্য-অন্তরাল থেকে বিষ-তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলেছে সভ্যতার প্রতীক একটি সুসজ্জিতা আধুনিকা তরুণীকে।

অশোকা কাছে থাকলে সে বলত—প্রতিমা আমাকে আর চাকরী করতে নিষেধ করেছে। সে বলেছে--শিল্পী হয়ে ওঠো তুমি, এতে যদি না খেয়ে মরতে হয় তাতেও রাজী।

অশোকার কথায় পঞ্চাননবাবু বলেছিলেন—ও ওর শ্বশুর-শাশুড়ীর সংসারে এমন করে জড়িয়ে পড়েছে যে, বেরিয়ে আসতে পারছে না!

এর পরে শুরু হলো দিব্যেন্দুর কলকাতার জীবন। বেলেঘাটার এক নিভৃত অঞ্চলে বাসা করেছিল দিব্যেন্দুর ভাই—নির্মলেন্দু। সামান্য চাকরী করে সে কোন সাবানের কারখানায়—শ-দেড়েক টাকা

মাইনে পায়। সুতরাং তার কাছ থেকে সংসারের সুরাহা হবে কতটুকু? কবিরাজী চিকিৎসা করতে হয়েছিল মায়ের, তাতেও মোটামুটি মন্দ খরচা হয় নি। কিন্তু মা কি স্থির হতে পারেন অতি সহজে? সাতদিন বৌকে নিয়ে খুব মেতে উঠলেন, তার পরেই, কী যে হলো, খালি বলেন—আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, আমি কুট্টি মাসিমার ওখানে গিয়ে থাকবো।

শুরু হলো এক অদ্ভুত জীবন সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। মাকে কাশী দিয়ে এলো নির্মলেন্দু। কিন্তু ছটি মাসও গেল না, খবর নেই কিছু নেই, তিনি হঠাৎ একাই ফিরে এলেন কলকাতায়। বললেন—মাসে মাসে পঁচিশটি করে টাকা, তা-ও পাঠাবি না? আমি কুট্টি মাসিমার কাছ থেকে ধার নিয়ে চলে এসেছি।

দিব্যেন্দু তাকালো নির্মলেন্দুব দিকে, কাবণ টাকাটা ত তারই পাঠাবার কথা ছিল! দিব্যেন্দুর চাকরা নেই বাকরী নেই—প্রতিমার গয়নাও ইতিমধ্যে নিঃশেষ, প্রতিদিনের অন্ন জোটাতেই সে অস্থির। নির্মলেন্দু দৈনন্দিন বাজারটা শুধু কবে দেয়, কিন্তু চাল-ডাল-মশলাপাতি বাড়িভাড়া? সেটা যে আসা-ইস্তক দিব্যেন্দুকেই চালিয়ে যেতে হচ্ছে!

নির্মলেন্দু দিব্যেন্দুব মুখেব দিকে তাকিয়ে বললে—দাদা, টাকা পাঠাও নি মাকে?

—আমি কোথা থেকে পাঠাবো!

নির্মলেন্দু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপরে বললে—মার আর তাহলে কাশী গিয়ে কাজ নেই।

কিন্তু তারপরে সংসাবে যা আরম্ভ হলো, তা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার দিব্যেন্দুর কাছে। এইসব দিনের কথা ভাবতে আজও তার কষ্ট হয়! ইতিমধ্যে প্রতিমার উৎসাহে আর প্রেরণায় রাত জেগে অন্য সবার আড়ালে—সে ছবি আঁকতে শুরু কবেছিল। আঁকার ব্যাপারে দু-চার জনের সঙ্গে তার পরিচয়ও হয়েছিল। তাদেরই

মাধ্যমে এক বিদেশী দূতাবাসের বিদেশী কর্মচারী তার একটি ছবি কিনে নিয়েছিলেন দুশো টাকায়। বলেছিলেন—চমৎকার। এক্‌স্‌প্রেশানিস্ট্‌!

তার সে সাফল্যে তার সেই সব বন্ধুরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিল। তারা তার ছবি সম্বন্ধে আগ্রহশীল ছিল, কিন্তু নিদারুণ বিরূপ সমালোচনাও করত। বলত ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া রং বসালেই কি ছবি হয়? ছবি আঁকার অ-আ থেকে আপনার শুরু করা উচিত।

এর মধ্যে ঘটে গেল ঐ ঘটনা, ছবিটা হঠাৎ ওভাবে বিক্রী হয়ে গেল। তার এক পরিচিত বন্ধুর বাড়িতেই রেখে এসেছিল সে ছবিটা। সেখানে এসেছিলেন এক সমালোচক, তিনি বললেন-- রাবিশ!

আবার আরেকদিন ঐ ভদ্রলোকেরই এক কবি-বন্ধু দেখে বললেন—অপূর্ব।

এবং সত্যি কথা বলতে কী, ঐ কবি-ভদ্রলোকেব মাধ্যমেই বিদেশী সেই শিল্প-রসিকের সঙ্গে হলো তার যোগাযোগ। তিনি ত ছবিটা কিনলেনই, উপরন্তু বললেন, পল গগ্যাঁ কি ভ্যান্ গগের মতো তুমি শক্তিশালী!

এ ব্যাপারে বন্ধুরা এত ক্ষেপে গেল, এবং এত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ল যে, তার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে ফেলল তারা। তারা আর আসেও না, তার ছবি নিয়ে আলোচনাও করে না।

তা, না করুক। সে যে ঐ দুশো টাকা পেলো, তাতে যেন তার দুহাজার টাকার কাজ হলো। মুদি, বাড়ি-ভাড়া, প্রভৃতি বহু ঋণ অনেকটা সে টাকা দিয়ে সামলে আনল দিব্যেন্দু। প্রতিমা আগের থেকে বহু শীর্ণ হয়ে গেছে, ঝি-চাকর নেই, সংসারের সব কাজ সে করে, অবশ্য সুনন্দাও কিছু-কিছু সাহায্য করে তাকে।

প্রতিমা তাকে নিভৃতে বললে—দেখলে ত? আমি জানতাম,

তুমি শিল্পী। তুমি আঁকো, আরো আঁকো ছবি, দেখবে লোকে তোমাকে একদিন বুঝবেই!

কিন্তু তার পথ ত আর কুসুমাস্তীর্ণ নয়। সেই বিদেশীটির সঙ্গে মাঝে মাঝে সে দেখা করতে যায়, তার উৎসাহে নিজেদের মধ্যেই সে একটা ছোটখাটো এগজিবিশনও করল একদিন, কিন্তু কী করবে মাত্র এক বিদেশী মানুষ? সমালোচক আর শিল্পীগোষ্ঠী একযোগে দাঁড়ালো তার বিরুদ্ধে, অধিকাংশই তাদের পত্র-পত্রিকায় রিভিউ করলেন না, দু-একজন যাঁরা করলেন, তাঁরা একেবারে পথে বসিয়ে দিলেন তাকে।

সেই বিদেশী ভদ্রলোকটি তার আরেকখানা ছবি কিনেছিলেন— ছোট ছবি—একশো টাকা দিয়ে। দিব্যেন্দু তার বন্ধুত্বকে স্মরণ করে টাকা চায়নি, তিনি জোর করে ওর হাতে দিয়েছিলেন সেই টাকা।

ইতিমধ্যে, ঝগড়া করে মা আবার চলে গেল কাশী। একাই। ঐ টাকাটা তখন পেয়েছিল বলে, মার হাতে কিছু টাকা সে দিতে পেরেছিল। আরও কিছু টাকা অবশ্য দিয়েছিল নির্মলেন্দু।

তারপর, যে দারিদ্র্যজীর্ণ উপবাসখিন্ন দিনগুলির শুরু হলো— সে সবের বর্ণনা করাও বোধকরি অসম্ভব। কোথা থেকে যে কী হয়! ভগ্নোদ্যম হয়ে দিব্যেন্দু একদিন বলে—ছবি আর আঁকব না! চাকরীই খুঁজব।

কিন্তু চাকরী পাওয়া কি অতো সহজ? পরবর্তী ছ'মাস যে কী অশান্তি আর কী কষ্টের মধ্য দিয়ে কাটতে লাগল ওদের, তা বলার নয়। সেই বিদেশী শিল্প-রসিক ভদ্রলোকটি ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছেন, নইলে একটি ছবি সে তাকে গছাতোই। বাকী রইল কমার্শিয়াল ছবি! তা-ও সে ক্ষুধার জ্বালায় আঁকতে রাজী, কিন্তু কে তাকে চিনিয়ে দেবে? কে তাকে খুলে দেবে সেই পথে প্রবেশ করবার স্বর্ণ-দ্বারটুকু? তার বোন বা ভাই এক একসময় গিয়ে থাকে দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের বাড়ি, কিন্তু তাদের দুজনের প্রতি,

অজ্ঞাত কারণে, আত্মীয়-স্বজনরাও ছিল বিরূপ। একেক দিন রাত্রে ক্ষিদের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করতে থাকে শরীর।

প্রতিমা বলে—ঠাকুরপোর কাছে কাল কিছু ধার চেয়েছিলুম, জানো? ঠাকুরপো বললে—দাদার কাছ থেকে নাও না? দাদার কাছে অনেক টাকা আছে লুকানো।

চমকে উঠে বসল দিব্যেন্দু, বললে—কী বললে তুমি!

প্রতিমা বললো—রাগ করো না, ঠাকুরপোর ধারণা, তোমার কাছে লুকানো টাকা আছে, চার হাজার টাকা।

মনে হলো, প্রচণ্ড একটা বিদ্যুতের শক্ এসে পড়ল ওর মাথার ওপরে, সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে যেন এক তীব্র বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। মনে পড়ে গেল, শ্রীপতির মুখখানা। মনে পড়ে গেল, সম্প্রতি কানে আসা শ্রীপতির সঙ্গে তার ভাই নির্মলেন্দুর নতুন করে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠার কথা।

আত্মীয়-স্বজনদের কেউ কেউ মাঝে-মাঝে আসত তাদের বাড়িতে। সমবেদনা জানাতে নয়, সাহায্য করতে নয়, খবরাখবর নিতে। তাদেরই কে একজন বলেছিল—ভালো কথা দিব্যেন্দু, নির্মলেন্দুকে সেদিন দেখলাম শ্রীপতির গাড়িতে। খুব হাসতে-হাসতে যাচ্ছে দুজনে।

—ভালোই ত।

বন্ধুদের মধ্যেও কেউ-কেউ আসত। সাহায্য করতে নয়, কেমন আছে জানতে। সেই সব শিল্পী-বন্ধুরা। তার মধ্যে অনিল ছিল একজনের নাম। বলতো—ছবি-আঁকা ছেড়েছ ভালই করেছ, চাকরী খোঁজ। ছবি আঁকা তোমার হবে না। বিদেশী লোক যতই তারিফ করুক না কেন, দেখলে ত, এদেশের শিল্প-রসিকেরা কী বললে? বৃথা চেষ্টা।

শুধু উপদেশ বর্ষণেই সে ক্ষান্ত হলো না, বললে—তোমার ভাইয়ের সঙ্গে সেদিন দেখা। জিজ্ঞাসা করলাম—কোথায় চললে?

তা বললে—আমাদের এক বড়লোক আত্মীয় আছে, তাঁদের বাড়ি যাচ্ছি। ঐ যে দাদা যাদের ওখানে কাজ করত।

চুপ করে স-ব শুনে যেত দিব্যেন্দু। 'হ্যাঁ' 'না' কিছুই বলত না। শুধু মনে মনে একটা প্রশ্ন জাগত। ব্যবসায়িক জগৎ-টা যে কী তা ত মর্মে-মর্মে জেনেছে সে। 'ব্যবসায়িক জগৎ'ও বলা যায়, 'বৈষয়িক বিশ্ব'-ও বলা যায়। সেখানে স্বার্থটা এত বড়ো, যে, স্বার্থ ও অর্থের কাছে মানুষের স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা এসব কর্পূরের মতো কখন যে নিঃশেষ হয়ে যায় কেউ বলতে পারে না। কিন্তু, সে ত গেল সংসারের একটা দিক, এবার অন্য দিকটা? শিল্পের জগতে আছে শান্তি, আছে সৌভ্রাত্র, আছে সহমর্মিতা, এই-ই ত সে জানত, কিন্তু কী এসে দেখল সে শিল্পের জগতে? এখানেও হীন রেষারেষি, চক্রান্ত আর হিংসার বিষ। মানুষ তাহলে যাবে কোন্ দিকে?

দুটি স্ত্রী-পুরুষ ক্ষিদেয় ছটফট করছে বিছানায় শুয়ে, অথচ, মুখে কেউ কারুর কাছে কষ্ট স্বীকার করতে চায় না। সে এক অপূর্ব মুহূর্ত!

দিব্যেন্দু জিজ্ঞাসা করল—ঘুম আসছে না?

প্রতিমা বললে—তোমার?

—না।

প্রতিমা বললে—আরেকটু জল খাবে? টিউব-ওয়েল থেকে টাটকা জল ধরে এনে রেখেছি।

—তাই দাও।

দুজনে উঠে দু গ্লাস জল খেয়ে আবার শুয়ে পড়ে।

প্রতিমা বলে—একটা কথা বলব?

—কী?

—ছবি আঁকছ না কেন?

চোখ দুটি ছলছল করে আসে, কিন্তু চোখের জল গোপন করতে হবে। কোনক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে দিব্যেন্দু বলে—কী হবে

এঁকে? শিল্পী-বন্ধুরা বলো, সমালোচকরাই বলো, কেউ আমাকে স্থান দিতে চায় না।

প্রতিমা আর কিছু বলে না, বালিসে মুখ লুকিয়ে নিজের মনে কাঁদে।

এমন দিনে, ঠিক এমনই দিনে, যখন চাকরীর জন্য আবার সে ছুটোছুটি করছে প্রতিমাকে না জানিয়ে, এবং যখন মনে মনে স্থিরই করে ফেলেছে বলা যায় যে, ছবি আর সে জীবনে আঁকবে না,—ঠিক তখনি এলো একখানি খামের চিঠি- কাশী থেকে।

অশোকার চিঠি। লিখেছে—অহল্যাবাঈ ঘাটে হঠাৎ মাসিমার সঙ্গে দেখা। আমি প্রথমটায় চিনতেই পারিনি। এত রোগা হয়ে গেছেন, যে বলার নয়। চাউনি দেখে বুঝলাম—মাসিমা। আমি পাশে বসে কথা বললাম, তখন চিনতে পারলেন। সন্ধ্যা হয়ে গেল, সবাই উঠে যাচ্ছে, উনি দেখি, এত দুর্বল যে উঠতে পারেন না।

বললাম, একী মাসিমা?

বললেন—শরীরটা খারাপ। তারপরে, আস্তে আস্তে ধরে নিয়ে আসছি, উনি বললেন—বাড়িতে ফিরব না এখন, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি দেখে ফিরব।

আমি বললাম—চলুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

গেলাম নিয়ে। আরতির পর, বাড়িতে ফিরছি ওঁকে নিয়ে। হঠাৎ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। বাড়িতে অনেক ছেলেপিলে থাকে, তাদের জন্য কিছু মিষ্টি কিনে নিয়ে ফিরছি। ফেরবার পথে, একটা মন্দিরের চত্বরে একটু বসেছি দুজনে, কী মনে করে দুটি মিষ্টি একটা শালপাতায় নিয়ে ওঁকে দিলাম, বললাম—মাসিমা এটা আপনি খান। আমি জল আনছি।

উনি হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা চেপে ধরলেন, তাকিয়ে দেখি, চোখে জল। অবাক হয়ে বললাম—কী হয়েছে মাসিমা?

বললেন—দাও মা, ওটা নিয়ে যাই।

অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে আছি, উনি বললেন—এই দিলে, এই-ই আমার সারাদিনের সম্বল, মা।

কী যেন মনে হলো, বলে উঠলাম—সারাদিন আপনার খাওয়া হয়নি!

মাথা নেড়ে জানালেন—না!

ওঁকে একটু কিছু খাইয়ে নিয়ে গেলাম ওঁর বাড়িতে। দেখি, অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে নীচের তলার একখানা ঘর, ছ'টাকা করে ভাড়া লাগে। আগে আগে তুমি যে দশ টাকা ক'রে পাঠাতে, তার থেকে পিওন আসা মাত্রই বাড়িওয়ালা ছিনিয়ে নিতো তার ছ'টাকা, বাকী চার টাকায় কি একটা মানুষের চলে?

শুনে, বড়ো রাগ হলো। পরক্ষণেই মনে হলো, কোন্ মানুষটির ওপরে রাগ করছি? সে ত এ ধরনের নয়। তবে?

না, সেসব কথার জন্যও তোমাকে লিখছি না। অভিযোগও করছি না। আমার মনে হয়, খুব একটা ভালো সময়ে মাসিমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। শরীব ওঁর খুব খারাপ, ক্রমাগত না খেয়ে খেয়ে শরীর একেবারে ক্ষয়ের পথে!

শুনলাম, উনি উঠেছিলেন এসে ওঁর এক মাসিমার কাছে। কিন্তু, তিনি যে কোনো কারণেই হোক, ওঁকে ঠাঁই দেন নি।

তোমরা যদি অনেক টাকা পাঠাতে, তাহলে হয়ত ওঁকে ওঁরা অনেক যত্ন করতেন। যাই হোক সে দুঃখ ক'রেও লাভ নেই। আমি যেজন্য চিঠি লিখছি সেটা শোনো ভালো করে। ডাক্তার ডেকে ওঁকে দেখিয়েছি! ডাক্তার বলছেন—বড্ড দেরী হয়ে গেছে।

দ্বিতীয়তঃ, উনি চাইছেন না ওষুধ খেতে। ভিতরে ভিতরে অনেকদিন থেকেই জ্বর হতো, আবার ছেড়েও যেতো। এখন শয্যাশায়ী বললেই হয়, জ্বরও ছাড়ছে না।

তুমি চিঠি পেয়েই চলে এসো। ওপরে ঠিকানা দিলাম। আমি

তোমার মায়ের ঠিকানাই দিলাম, আমি ওঁর কাছেই আজকাল আছি।

স্তম্ভিত হয়ে গেল দিব্যেন্দু। নির্মলেন্দু কোনো টাকা পাঠায়নি মাকে? তার সঙ্গে দেখামাত্রই তাকে কথাটা জিজ্ঞাসা করল দিব্যেন্দু। সে বললে—আমার একটু অসুবিধা হয়ে গিয়েছিল এবার। কেন, তুমি পাঠাওনি?

—কোথা থেকে পাঠাবো!

মুহূর্তে যেন জ্বলে উঠলো নির্মলেন্দু, বললে—চারটি হাজার টাকার তবিল নিয়ে বসে আছো, অথচ, মা মারা যাচ্ছে না খেতে পেয়ে! তোমার লজ্জা করে না?

দিব্যেন্দু কোনো উত্তর করেনি সেদিন। তবে, উত্তর না করলেও নিশ্চুপে ত বসে থাকা চলে না। ওর অফিস, কিন্তু দিব্যেন্দুর ত অফিস নেই, সে চুপচাপ বসে থাকবে কী করে?

এত দুঃখের মধ্যেও একটা সান্ত্বনা ছিল—প্রতিমা। সে ওকে ভুল বোঝেনি। এবং শুধু তাই নয়, তারই শেষ সম্বল -একটি লুকানো গিনি নিয়ে গিয়ে বিক্রী করে দিয়ে এলো দিব্যেন্দু।

সেই টাকা, আর কিছু টাকা অবশ্য নির্মলেন্দু দিয়েছিল, নিয়ে, যখন কাশী গিয়ে পৌছল দিব্যেন্দু, তখন ঠিক সব শেষ না হলেও সব-কিছু শেষ হবার পথে।

মায়ের শিয়রে বসে ছিল অশোকা, বললে- ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে।

সম্ভবতঃ দিব্যেন্দুকে শেষ দেখা দেখবার জন্যই প্রাণটা ছটফট করছিল। ক্ষমাশীল, স্নেহশীল, অপূর্ব এক মুখ—কণ্ঠরোধ হয়ে গেছে—কিন্তু চোখ দুটি যেন কথা বলতে চায়—এসেছিস খোকা? বোস।

চলে গেলেন দিব্যেন্দুর মা।

মণিকর্ণিকার ঘাটে লেলিহান চিতার শেষ রশ্মিটুকু নিভে যাচ্ছে, চুপচাপ পাথরের মতো বসে আছে দিব্যেন্দু, ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ালো অশোকা।

কোন কথা নয়, কিছু নয়।

তারও অনেক পর, শেষতম কৃত্যটুকু করে ফিরে আসছে দিব্যেন্দু ঘরের দিকে, তখন কথা বলল সে। বললে—অশোকা, এ যে হবে, এ আমি ঠিক ভাবতে পারিনি। ভাই-বোনেরা যখন কাছে এসে জিজ্ঞাসা করবে—মা কেমন আছে? কী উত্তর দেবো?

অশোকা বললে—টেলিগ্রাম করে দিয়েছি।

আর কিছু বলল না দিব্যেন্দু। ঘরে ফিরে এলো প্রদীপটির কাছে। অনেকক্ষণ তার কাছে বসে থাকবার পর উঠে দাঁড়ালো অশোকা, বললে—যাই এখন?

মুখ তুলে ওর দিকে শুধু তাকালো দিব্যেন্দু। কিছু বলতে পারল না। অশোকা বললে—কাল সকালে, তোমার চলে যাবার আগেই আসব।

বলে, কয়েক পা এগিয়ে ফিরে এলো অশোকা, বললে—তোমার কাছে বসে তোমার সব কথা শুনতে ইচ্ছা করছে, কিন্তু উপায় নেই। সে মারা যাবার আগে একরকম ছিল, সে চলে যাবার পরে হয়েছে অন্য রকম। শ্বশুর শাশুড়ী এখন আমাকে একেবারেই ছাড়তে চায় না, বড্ড মায়ায় পড়ে গেছি।

যেন আর্তকণ্ঠে এবার ডেকে উঠল দিব্যেন্দু—অশোকা!

অশোকা বললে—আমি জানি, স-ব বুঝতে পারছি। মাকে এভাবে হারানোর মধ্যে সন্তানের যে কী বেদনা থাকে, তা আমি বুঝতে পারি। তুমি শিল্পী, বেদনার মধ্য থেকেই তোমার হাত দিয়ে হয়ত বড়ো কিছু জন্ম নেবে।

উঠে দাঁড়ালো দিব্যেন্দু, বললে—শিল্পের পিছনে অন্ধের মতো এভাবে ছুটে চলবার জন্যই বুঝি একটা প্রাণ এমন ভাবে অবহেলায় চলে গেল! তার থেকে যদি ব্যবসায়েই যুক্ত থাকতাম, যদি সত্যিই অপহরণ করতাম চারহাজার টাকা— !

অশোকা ফিরে দাঁড়ালো, অবাক হয়ে বললে—কী বললে!

তারপর, ওর কাছে বসে, ধীরে ধীরে এক-এক করে সবই শুনল অশোকা। এবং শুনে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—চমৎকার! বেশ ছিলে তাহলে! আমি ভাবছি তুমি ভালো আছো, সুখে আছো। না, আমাকেই দেখছি একটা কিছু করতে হচ্ছে। থাকো তুমি, আমি কাল সকালেই আসছি। আমিই তোমাকে নিয়ে যাবো কলকাতায় প্রতিমার কাছে।

তাই এসেছিল অশোকা। বলেছিল—এ দারিদ্র্য যে তোমাদের শেষ করে ফেলবে। বরং তুমি আমার বাবার কাছে চলো আমার সঙ্গে। তাঁর ব্যবসাতেই না হয় আবার গিয়ে ঢুকবে।

প্রতিমার চোখ দুটি যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল ধ্বক্ করে, বললে—না। দারিদ্র্য আমাদের কোথায় নিয়ে যায়, তার শেষ দেখে ছাড়ব! আজ শিল্পীদেব জগতে সবাই আমার স্বামীকে দাবিয়ে রাখতে চাইছে, কিন্তু তা যদি শেষ পর্যন্ত পারত, তাহলে বুঝতাম তারা শক্তিমান। ও আর কিছু করবে না অশোকাদি, শুধু ছবিই আঁকবে। আমি জানি ওর মূল্য ও একদিন পাবেই। সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনা ও আঁকুক, সাধারণ মানুষই ওকে একদিন বুকে তুলে নেবে!

অশোকা উঠে দাঁড়ালো।

প্রতিমা বললে—চললে নাকি?

বলেই, হঠাৎ দুহাতে জড়িয়ে ধরল অশোকাকে, অশ্রুবিজড়িত

কণ্ঠে বলে উঠল—তোমার ত আর কোনো বাঁধন নেই অশোকাদি, তুমি থাকোনা আমাদের মধ্যে ?

—পাগল !—বলে নিজেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিলো অশোকা, বললে—কাশী আমাকে যে ফিবে যেতে হবেই ভাই ! ওদের থেকে যে নিজেকে ছাড়িয়ে আনব, এমন সাধ্য আমার নেই !

অশোকা চলে গেল। দিব্যেন্দুর চোখে তখন ভাসছে অন্য এক ছবি। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একখানি বোগজীর্ণ পাণ্ডুব মুখ, পাশে একটি ছোট্ট প্রদীপের শিখা, তারই আলোয় দেখা যায়, সেই মুখ কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাব খোকা দুটি, তার মেয়ে, তারা কি আসবে না ? পাবো না কি তাদের শেষ বাবেব মতো দেখতে ?

—না না, এ আমাকে আঁকতেই হবে ! দিব্যেন্দু নিজেই যেন নিজের অস্থিব মনটাকে বাব বার বলতে থাকে,—মাগো, তোমাব অন্তর্বেদনাব ছবি আমি এঁকে যাবোই। হোক সে আমার শেষ ছবি !

তারপব, মাস দুই-ও কাটেনি। সেই বিদেশী ভদ্রলোক ফিরে এসেই খোঁজ কবলেন দিব্যেন্দুব। তাব চিঠি এলো দিব্যেন্দুর কাছে। যে ছবিখানি সে প্রাণপণে আঁকছিল, সেখানিই নিয়ে গেল দিব্যেন্দু।

সেই কম্পমান প্রদীপ-শিখা ! সেই বিশীর্ণ মাতৃমুখের তীব্র আকুতি !

তিনি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, বললেন—এ একটি সৃষ্টি !

এবং একটু বেশী মূল্যেই ছবিটা কিনে নিয়েছিলেন তিনি। একেবারে চাব হাজাব টাকা।

টাকা হাতে নিয়ে যেন পাথর হয়ে গেল দিব্যেন্দু, মুহূর্তের জন্য মনে হলো,—এ কার জন্য ?

পরক্ষণেই বুঝি সম্বিত ফিরে পেলো দিব্যেন্দু, তাড়াতাড়ি টাকাটা নিয়ে চলে এলো বাড়ি। প্রতিমা আছে। নির্মলেন্দু আছে। সুনন্দাকেও নিয়ে আসবে সে আত্মীয়দের বাড়ি থেকে। তারপর? নির্মলেন্দুকে ডেকে বলবে—এই নে চার হাজার টাকা। শ্রীপতিকে দিয়ে আয়। নিজের হাতে সে তুলে নিক এই টাকা।

॥ শেষ ॥

লেখকের অন্যান্য বই :

## উপন্যাস

- জনপদবধূ
- দেবকন্যা
- নীলসিন্ধু
- সীমাস্বর্গ
- এ জন্মের ইতিহাস
- জলকন্যার মন
- তীরভূমি
- বিদিশার নিশা
- নতুন নাম নতুন ঘব
- মধ্যদিনের গান
- কতো আলোর সঙ্গ
- শ্বেত কপোত
- স্বপ্ন-সঞ্চাব
- এই তীর্থ

## গল্প

- সিন্ধুর টিপ
- নীলাঞ্জনছায়া
- এক আশ্চর্য মেয়ে
- একটি রঙ-করা মুখ

## নাটক

- পথ